সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন • অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩

# শিক্ষালোক

কোনো গাঁয়ে কোনো ঘর কেউ রবে না নিরক্ষর

# সিদীপে যথাযোগ্য মর্যাদায়
# মহান বিজয় দিবস উদযাপন

যথাযোগ্য মর্যাদায় ২০২৩ সালের মহান বিজয় দিবস উদযাপন করেছে সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)। বাঙালির এই বিজয়োৎসবে শরিক হয়ে সিদীপ তার প্রধান কার্যালয়সহ ভবন ও স্থাপনাসমূহ আলোকসজ্জায় সজ্জিত করে। সব শাখা অফিস থেকে স্থানীয় প্রশাসন নির্দেশিত স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় এবং সিদীপ কর্মীগণ স্থানীয় প্রশাসন আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সিদীপের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির সব শিক্ষাকেন্দ্রে শিশুদের জন্য এ উপলক্ষে রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয় এবং তাদের পুরস্কৃত করা হয়।

*আয়েশা, ২য় শ্রেণি, সিদীপ উঠান স্কুলের শিক্ষার্থী*
*কাশিমপুর ব্রাঞ্চ, গাজীপুর*

*আতিকা ইবনাত জেবা, শিশু শ্রেণি, সিদীপ উঠান স্কুলের শিক্ষার্থী*
*সিরাজদিখান ব্রাঞ্চ, মুন্সিগঞ্জ*

সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন
ইমেইল: shikkhalokcdip@gmail.com, ফেসবুক: শিক্ষালোক বুলেটিন

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া

# শিক্ষালোক

অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০২৩ ● ১০ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

## সূচি


| | |
|---|---|
| ব্রিটিশের শিক্ষানীতি - শহিদুল ইসলাম | ২ |
| পল্লী পাঠাগারের কথা - কাকলী খাতুন | ৮ |
| চাঁদপুর সদর উপজেলায় নদী ভাঙ্গন - মাহবুবুর রশীদ অরিস | ১০ |
| এনজিওতে আপনি কেন চাকরি করবেন - মোঃ সেলিম উদ্দীন | ১১ |
| মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার উদ্বোধন | ১৪ |
| পিকেএসএফের এএমডি'র সিদীপ প্রকল্প পরিদর্শন | ১৬ |
| কালের সাক্ষী আদু দা - তোফাজ্জল হোসেন তারা | ২৮ |
| এক সফল কৃষানির গল্প - মো. ইসরাফিল হোসেন | ২৯ |
| এক নারীর সফলতার কথা - মো. আব্দুল মান্নান সরদার | ৩০ |
| সিদীপের ২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা | ৩১ |
| আমার দেখা ছবি: অন্তর্জাল - আশরাফ আহমেদ | ৩২ |


**প্রধান সম্পাদক**
মিফতা নাঈম হুদা

**সম্পাদক**
ফজলুল বারি

**নির্বাহী সম্পাদক**
আলমগীর খান

**প্রচ্ছদ**
শিল্পী সামী আজফার

ডিজাইন ও মুদ্রণ
আইআরসি ⊕ irc.com.bd

# সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা এখনও নানারকম পরিবর্তন-সংস্কার, পরীক্ষা-নিরিক্ষা, চড়াই-উৎরাই ও বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলমান। তর্কের শুরু অনেক আগে বাংলায় ব্রিটিশ আমল থেকেই। এখনও যেন তারই জের চলছে। অথচ ব্রিটিশ-পূর্ব বাংলায় একটা বিস্তৃত প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা সারা বাংলা তথা ভারতবর্ষ জুড়ে প্রচলিত ছিল যা ছিল অসাম্প্রদায়িক, গণমুখী ও সমাজ-পরিচালিত। ইংরেজ পাদ্রী উইলিয়াম এডামের ১৮৩৫ থেকে ১৮৩৮ পর্যন্ত সরেজমিন প্রতিবেদন থেকে এর স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। এডামের তিন খণ্ডের প্রতিবেদনটিই ব্রিটিশ-প্রবর্তিত নতুন শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি হওয়া দরকার ছিল। এডাম দেশি ভাষায় গণমুখী প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তাব করেছিলেন। আর নতুন শিক্ষাব্যবস্থাটি দাঁড় করাতে বলেছিলেন পাঠশালা ধরনের প্রচলিত শিক্ষাকাঠামোর ওপর।

কিন্তু ব্রিটিশ শাসকদের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন কিছু, বাংলার সাধারণ মানুষের সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতি নয়। তাই এ শিক্ষাব্যবস্থা অচিরেই ইংরেজ পণ্ডিত থমাস ব্যাবিংটন মেকলের ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হলো। এডামের আন্তরিক, দূরদর্শী ও শ্রমসাধ্য প্রতিবেদনের ঠাঁই হলো ইংরেজের গুদামঘরে। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় নামের কারখানায় এমন মানুষ তৈরি শুরু হলো যারা কেবল গায়ের রঙেই ভারতীয় কিংবা বাঙালি, কিন্তু মননে, রুচিতে ও সংস্কৃতিতে শাদা ইংরেজ–অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসকদের একটা বশংবদ গোষ্ঠি। এই জের আমরা এখনও বহন করে চলেছি। আমরা নিশ্চিত যে, শিক্ষাবিদ শহিদুল ইসলামের গবেষণামূলক মূল্যবান লেখা "ব্রিটিশের শিক্ষানীতি: রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ" এ ব্যাপারে আমাদের ভাবনাচিন্তাকে আরও শাণিত ও সম্প্রসারিত করবে। তাই গুরুত্বপূর্ণ এ লেখাটি এবারের প্রধান বিষয়।

এছাড়াও এবারের শিক্ষালোকে আছে একটি স্থানীয় পাঠাগার ও সংস্থা-পরিচালিত মুক্তপাঠাগারের বিভিন্ন কার্যক্রমের কথা। এনজিওতে সমাজসেবামূলক কাজকে পেশা হিসেবে গ্রহণের বিস্তৃত সুযোগ নিয়ে একটি ভাল লেখা রয়েছে। এটি লেখকের কর্মজীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতাপ্রসূত ও সুচিন্তিত। তাই এনজিওর মাধ্যমে সমাজকর্মকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে উৎসাহব্যঞ্জক। গ্রামীণ মানুষের দুটি সাফল্যের কথাসহ রয়েছে আরও কিছু বিষয়। নতুন বছর আরও সুন্দর ও শুভ হউক।

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)
বাসা নং-১৭, রোড নং-১৩, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি লি:, শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা-১২০৭, ফোন: ৪৮১১৮৬৩৩, ৪৮১১৮৬৩৪।
Email : info@cdipbd.org, web: www.cdipbd.org

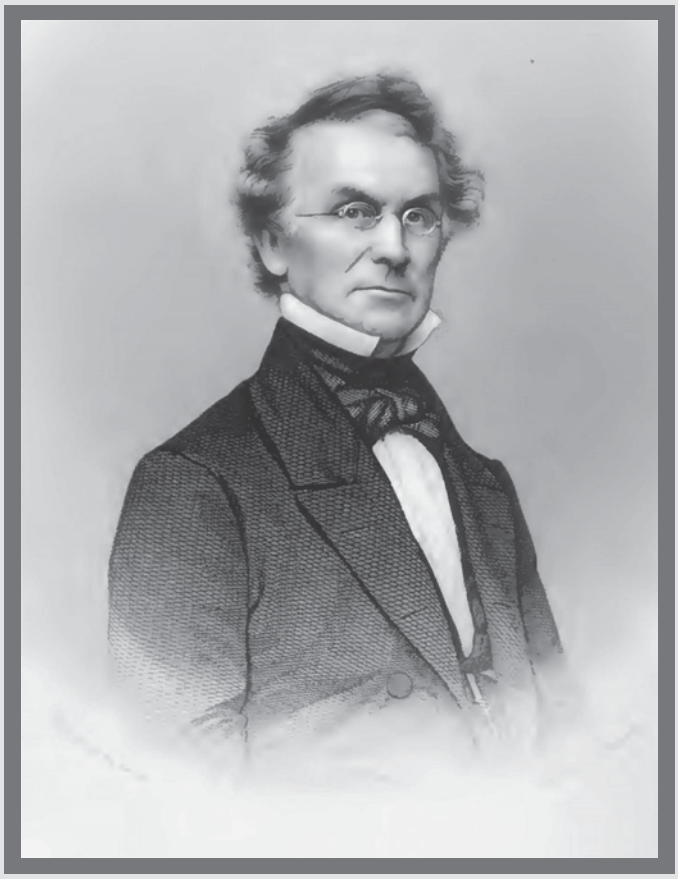

উইলিয়াম এডাম
*(১৮০৭ - ১৮৮০)*

# ব্রিটিশের শিক্ষানীতি

## রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ

শহিদুল ইসলাম

দীর্ঘ উপনিবেশিক আমলে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো উপনিবেশসমূহের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির রূপান্তরের জন্য অর্থ, শ্রম ও বুদ্ধি নিয়োগ করে; ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে যেন ঔপনিবেশিক শাসনাবসানে সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশগুলোর ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির ওপর তার আধিপত্য রাখতে পারে। ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিই তখন হয়ে ওঠে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের প্রধান হাতিয়ার। আন্দোলন-সংগ্রাম-বিপ্লবের মাধ্যমে উপনিবেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিকে মুক্ত করাটা সহজ, কিন্তু সাংস্কৃতিক উপনিবেশবাদ ধ্বংস করা কঠিন।

১৮৩৫ সালটিকে আমরা এদেশে আধুনিক শিক্ষা প্রচলনের ইতিহাসের পাতা থেকে কোনভাবেই বাদ দিতে পারি না। ওই বছর ব্রিটিশ সরকার হঠাৎ করেই তার আগের ৭৮ বছরের শিক্ষানীতির সম্পূর্ণ বিপরীত একটি নতুন শিক্ষানীতি গ্রহণ করে। ১৮৫৪ সালে উডের ডেসপাচের আগের ২০ বছর সরকারী নীতি হিসেবে তা অনুসরণ করা হয়। সরকার এতদিনের প্রচলিত শিক্ষার প্রাচ্যনীতির পরিবর্তে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচারে সর্বাত্মক আত্মনিয়োগ করে। আধুনিক শিক্ষার গাড়িটি চালুর মুহূর্তে ব্রিটিশ সরকার এক সূক্ষ্ম অথচ সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিল। সেদিনের প্রতিরোধহীন পরিবেশে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে সে ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করা সহজ হয়েছিল। এদেশে আধুনিক শিক্ষার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সেই মুহূর্তে তিনজন ব্যক্তি রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন। ১৮২৮ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল হয়ে আসেন। তাঁকে অনুসরণ করে আসেন উদারপন্থী বলে পরিচিত মেকলে ১৮৩৪ সালে সুপ্রিম কাউন্সিলের আইন-রচয়িতা হিসেবে। লর্ড বেন্টিংক তাঁকে জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশনের সভাপতির দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করলে তিনি তা গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৩৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারী আধুনিক ইংরেজী শিক্ষার প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করেন এবং একই বছর ৭ মার্চ গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিংক সেটি অনুমোদন করে বলেন, 'Promotion of European literatures and science among the natives of India'র জন্য এখন থেকে 'all funds appropriated for the purpose of education would be best employed on English education alone,' ভারতবাসীর মধ্যে ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান বিস্তারের জন্য এখন থেকে সমস্ত অর্থ 'কেবল' ইংরেজী শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষার ওই যুগান্তকারী অথচ অবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তটি গৃহীত হবার পর কেবল আরবী-ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষাই নয়, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সম্ভাবনার দরজাটি বন্ধ হয়ে গেল। সেই শিক্ষানীতি থেকে আমরা আজও বের হয়ে আসতে পারি নি।

তৃতীয় জন হলেন পাদ্রী উইলিয়াম এডাম। তিনি অবশ্য অনেক আগেই খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য এদেশে এসেছিলেন। ১৮১৮ সালের ১৯ মার্চ তিনি শ্রীরামপুরে এসে পৌছান। ধর্ম প্রচারের স্বার্থে তিনি এদেশে উঁচু-নীচু সকল শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করেন এবং এদেশে প্রচলিত শিক্ষা সম্পর্কে একটি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করেন। তিনি বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা শেখেন এবং মানুষের সঙ্গে আপন-জনের মতো মেলামেশা করেন। ধর্ম-বর্ণ, জাত-পাত, উঁচু-নীচু সকল মানুষের সঙ্গে দীর্ঘ প্রায় ১৭ বছর মেলামেশার পর তিনি বুঝতে পারেন যে যদি এদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছুতে হয়, তাহলে সংস্কৃত ও আরবী-ফার্সী ভাষার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সেসব ভাষার সাহিত্য ও বিজ্ঞানের জন্য সরকারী অর্থ খরচ করে তা সম্ভব নয়। সেটি হবে মস্তবড় এক ভ্রান্তি। এ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তিনি তৎকালীন হিন্দু ও মুসলমান রঅভিজাত সমাজপতিদের দাবী অসারতা প্রমাণ করেন। আমরা জানি সেকালের রক্ষণশীল হিন্দু অভিজাত শ্রেণী সংস্কৃত ভাষার পক্ষে কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছিলেন, তেমনি মুসলিম অভিজাত শ্রেণী দাঁড়িয়েছিলেন আরবী ও ফার্সীর পক্ষে। এতে প্রথম যুগে 'শিক্ষার প্রাচ্যনীতি গ্রহণে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকদের কাজ অনেকটা সহজ হয়ে যায়। কলকাতার মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮১ সালে কলকাতায় মাদ্রাসা স্থাপন করেন। দশ বছর পর ১৭৯১ সালে বেনারসের রেসিডেন্ট সেখানে স্থাপন করেন সংস্কৃত কলেজ। উইলিয়াম এডাম আরবী, ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁর প্রস্তাব ছিল মাতৃভাষার মাধ্যমে একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার। একইভাবে তিনি এ সিদ্ধান্তে আসেন যে শিক্ষার মাধ্যমে যদি এদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক মান উন্নত করতে হয়, তাহলে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে কেবল মুষ্টিমেয় কিছু উঁচু ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তা সম্ভব নয়। এ সিদ্ধান্তে তিনি পাশ্চাত্যবাদী ইংরেজ ও উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর বাঙালীদের দাবী নস্যাৎ করে দেন। তাঁর মতে উন্নয়ন তখনই সম্ভব যখন পাশ্চাত্য শিক্ষাকে এদেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া যাবে। সেটা সম্ভব একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা দানের নীতি গ্রহণ করে। কোন নতুন এবং এদেশবাসীর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত শিক্ষা কাঠামোর মাধ্যমে সেটা সম্ভব নয়। তিনি মনে করেন যে স্মরণকাল থেকে এদেশে যে শিক্ষার একটি কাঠামো ফলগুধারার মতো প্রবহমান, তা যতোই ত্রুটিপূর্ণ হোক, হোক না তা ঘুণে ধরা ক্ষয়িষ্ণু, সেই শিক্ষা কাঠামোর ওপরেই আধুনিক শিক্ষার কাঠামোটি গড়ে তুলতে হবে। পুরনো কাঠামোর মধ্যেই আধুনিক বুর্জোয়া পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের পাঠ্যসূচী অন্তর্ভুক্ত করা চাই। এডামের ওই বক্তব্যের ১১০ বছর পর শিক্ষাবিদ নূরুল্লাহ ও নায়েক তাদের বইতে লেখেন, "Finally, we find that, in most countries of the world which are now educationally progressive, the national system of education was built up on the foundations of the traditional system-inspite of its admitted and numerous defects. In England, for instance, mass education was spread by gradual expansion and improvement of the defective voluntary school which already existed." (Nurullah, Naik: 3:11)। খোদ ইংল্যান্ডে ফ্রি ও বাধ্যতামূলক গণশিক্ষার ধারাটি গড়ে উঠেছিল, স্বেচ্ছাচালিত, ত্রুটিপূর্ণ, ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়ের ভাঙাচুরা কাঠামোর ওপরে। সেই কাঠামোকে ধ্বংস করে নয়। শিক্ষাবিদ মাইকেল স্যাডলার সে পদক্ষেপের সমর্থনে লিখেছিলেন, "Although the teachers were, as a rule, not trained and often unable to impart knowledge, although the buildings were frequently not suitable for schools, the books deficient in numbers and quality, the attendance of the scholars very irregular, yet the first step not only had been taken but the children had been accustomed to school life." (Nurullah, Naik : 3 : 22-23)। ইংল্যান্ডে গণশিক্ষা প্রচলনে সে দেশের সামন্তবাদী স্বেচ্ছাসেবী স্কুল যে ভূমিকা

রেখেছিল, ভারত বা বাংলাদেশের দেশীয় শিক্ষা ধারাটি এদেশে আধুনিক বুর্জোয়া শিক্ষা প্রচলনে একই রকম ভূমিকা রাখতে পারতো।

পাদ্রী উইলিয়াম এডাম তাঁর সুদীর্ঘ শিক্ষা রিপোর্টের শেষে সেই সিদ্ধান্তই জানান। 'I, however, expressed the opinion that, as far as my information then enabled me to judge, existing native institutions from the highest to the lowest, of all kinds and classes, were the fittest means to be employed for raising and improving the character of the people that to employ those institutions for such a purpose would be "the simplest, the safest, the most popular, the most economical, and the most effectual plan for giving that stimulus to the native mind which it needs on the subject on education, and for eliciting the exertions of the natives themselves for their own improvement, without which all other means must be unavailing". (Adam 1: 349-350)। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা তাঁর সেই যুক্তিগ্রাহ্য ও বিজ্ঞানসম্মত প্রস্তাবটিকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দেয় নি। পুরনো দেশজ শিক্ষা কাঠামোকে তারা মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় এবং সময় ও অর্থ ব্যয় করে আজকের আধুনিক নামের সিঁড়িভাঙা শিক্ষার কাঠামোটি গড়ে তোলার পিছনে। সময়ের সাথে সাথে আজ সেই সিঁড়িভাঙা আধুনিক শিক্ষার কাঠামোটি আমাদের কাছে সুপরিচিত। কিন্তু এই কাঠামোটি পরিচিত হতে এত দীর্ঘ সময় লেগেছে যে, যা ক্ষতি হবার তা হয়ে গেছে। আজও আমরা শিক্ষাকে শতভাগ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে পারি নি। নুরুল্লাহ্-নায়েক ভারতের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, "It could hardly compensate for the loss of the indigenous schools with the result that the educational position of India in 1921 was hardly better than that in 1821". (Nurullah, Naik 3:26) আজ এই বক্তব্যটি হৃদয়ঙ্গম করা বেশ কঠিন। বর্তমানের আধুনিক শিক্ষা ধারা চালু হবার আগে কি এদেশে কোনো ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না? ইংরেজরা আসার আগে এদেশে যে একটি শিক্ষাধারা চালু ছিল, উইলিয়াম এডাম তা নিয়ে গবেষণা করে তিন খন্ডে ওই প্রতিবেদনটি লিখেছিলেন যাকে একটি উৎকৃষ্ট শিক্ষা-রিপোর্ট বলে সবাই মনে করেন। বাংলার দেশজ শিক্ষাধারার ওপর পরমেশ আচার্যের বইটি এক নতুন সংযোজন। তিনি প্রমাণ করেছেন "পাশ্চাত্য শিক্ষা চালু হওয়ার আগেও যে এদেশে একটা প্রথাবদ্ধ দেশজ শিক্ষাধারা চালু ছিল, সে খবর অনেকেই রাখেন না। আর খুব অল্প লোকেরই ধারণা আছে এই শিক্ষাধারাটি কি ধরনের ছিল। "পুঁজিবাদের আগে সামন্তবাদী পৃথিবীর প্রতিটি দেশে এক বা একাধিক 'দেশজ শিক্ষাধারা' প্রচলিত ছিল। সে শিক্ষাব্যবস্থার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল সামন্ততান্ত্রিক–কিন্তু স্থানীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত।

মাইকেল স্যাডলারের বক্তব্যে ইংল্যান্ডের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি চিত্র পাওয়া যায়। অনেকটাই আমাদের মতো। বাংলার তথা ভারতবর্ষের সামন্তবাদী শিক্ষাধারাটি ইউরোপ বা অন্য কোনো দেশের চেয়ে নিকৃষ্ট ছিল না। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথমে কিংবা আঠার শতকের শেষ দশকে ইউরোপ থেকে বুর্জোয়া দর্শন উপযোগবাদের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে ভারতের উপকূলে। সেইসাথে ফরাসি বিপ্লবের বাণী; হিউম বেন্থাম, জন স্টুয়ার্ট মিল, থমাস পেইনের চিন্তাধারা বাংলার তথাকথিত পুনর্জাগরণের নেতৃবৃন্দকে উত্তাল করে তোলে। পরমেশ বলছেন 'উনিশ শতকের তথাকথিত বাংলার নবজাগরণের হোতারা প্রায় সকলেই মেকলে ও বেন্টিংকের শিক্ষা নীতিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। যদিও মেকলের মিনিটে ওই শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য স্পষ্ট করেই বলা ছিল। এবং এঁরা সে সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিলেন। দেশীয় উঁচুশ্রেণীর সাগ্রহ সমর্থনেই উনিশ শতকে ইংরেজী শিক্ষার অবাধগতি প্রসার সম্ভব হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।" (পরমেশ ৪ : ৯) এর ফল কি হয়েছিল? নূরুল্লাহ্ নায়েক বলছেন, The results have been disastrous. (Nurullah, Naike 3 : 26)। পরমেশ বলছেন, "সামন্তযুগে এদেশে 'শিক্ষার উপর সরকারের সরাসরি কোন কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছিল না। প্রধানত বেসরকারী উদ্যোগেই শিক্ষার বিকাশ ও বিস্তার ঘটতো।... কিন্তু ব্রিটিশ শিক্ষার ভূমিকা সম্পূর্ণ আলাদা। দেশের উপর ব্রিটিশ অধিকার কায়েম রাখার জন্যই ব্রিটিশ শিক্ষা ও শাসনপ্রথা এদেশে চালু করা হয়। সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন কেন্দ্রীয় কাঠামোর আওতায় একক ধারার এমন এক সর্বময় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়, যার দাপটে দেশজ শিক্ষার অপমৃত্যু ঘটে। সবচাইতে বড় ক্ষতি হয় দেশজ সাধারণ শিক্ষাধারার। দেশজ সাধারণ ব্যবহারিক শিক্ষাধারার পরিবর্তে একক শিক্ষাধারার প্রারম্ভিক স্তর হিসেবে কেতাবী শিক্ষার যে প্রাথমিক স্কুল গড়ে ওঠে তার সঙ্গে গতরখাটা সাধারণ মানুষের জীবনের কোন যোগ থাকে না, ফলে তাদের অচিরেই শিক্ষার আঙিনা থেকে বিদায় নিতে হয়।" (পরমেশ ৪:৭-৮)। শুধু আমাদের দেশেই নয় ঔপনিবেশিক ইউরোপ তার অন্য উপনিবেশগুলোতেও তাদের শিক্ষানীতি ও ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়। (Pennycook 35; R. Phillipson 36) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা ভিন্ন কিছু নয়। ঔপনিবেশিক আমলে ইউরোপীয় শিক্ষাদর্শন ও ব্যবস্থা সেখানে আমদানী করা হয়। বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের পর সেখানে একটি 'uniquely American educational system' গড়ে তোলা হয়। (Ornstein & Levine 5 : 162) এ সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায়ের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলছেন, "আধুনিকীকরণের ভাষা হচ্ছে ইংরেজী (আজও কি তাই নয়?) এবং যে শিক্ষাব্যবস্থা ও পদ্ধতির মাধ্যমে আধুনিকীকরণের বিদ্যা আয়ত্ত করা যায়, তা হচ্ছে পাশ্চাত্য ইংরেজী শিক্ষাব্যবস্থা, পাঠক্রম ও পদ্ধতি। রামমোহন থেকে শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত এ সম্বন্ধে কখনো কেউ সন্দেহমাত্র করেন নি। এমন কি রামমোহন ও রামমোহন গোষ্ঠীর প্রতিপক্ষ রাধাকান্ত দেব এবং তাঁর সহধর্মী, সহকর্মীরাও নন। সকলেই ইংরেজী ভাষাশিক্ষার পক্ষপাতী শুধু নন, উদগ্রীবও। ...সকলেই ইতিমধ্যে জেনে নিয়েছেন রুটির কোন দিকে মাখন লাগাতে হয়। ইংরেজী ভাষা ও ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত না হলে যে ইংরেজ প্রবর্তিত আর্থিক সুযোগ-সুবিধাগুলোর সদ্ব্যবহার করা যায় না। ...রবীন্দ্রনাথের আগে কেউ কখনও এ ব্যাপারে প্রতিবাদ উচ্চারণ করেন নি। ...Orientalist-দের মধ্যে কেউ কেউ

বা সংস্কৃত-আরবী-ফার্সীর পক্ষ নিয়ে দু'চার কথা বলেছিলেন, বাংলার জন্য একটি বাক্যও কেউ কখনো উচ্চারণ করেন নি।" (রায় ৭:১৩)।

তারপর লিখছেন, "একথা সত্য ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা মধ্যযুগীয় পরম্পরা ও সংস্কৃতির বন্ধ সংকীর্ণ জলাশয় থেকে উদ্ধার করে এনে আমাদের আধুনিক পৃথিবীর প্রশস্ত আঙিনায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।" কিন্তু "আজ ক্রমশ পরিষ্কার হচ্ছে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মহলে ইংরেজী ভাষার এই আধিপত্য, ইংরেজী শিক্ষাব্যবস্থার এই নির্বাধ সর্বভারতীয় বিস্তার (যার সূচনা বঙ্গভূমের পুনরুজ্জীবনে) বঙ্গভূমি ও ভারতবর্ষের পক্ষে শুভকর হয়নি, কল্যাণকর হয়নি। এর ফলে দেশের মানুষ দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, এক ভাগে অতি স্বল্পসংখ্যক ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ শিক্ষিত আধুনিক 'ভদ্র' সন্তান যারা উনিশ শতকী পুনরুজ্জীবনের ফসল, আর একদিকে (যেহেতু আবশ্যিক ও সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বলে কিছু চালু ছিল না, আজও নেই) অগণিত নিরক্ষর, পরম্পরাতাড়িত 'ইতর' জনসাধারণ "(রায় ৭:১৪)। তাঁর এ মূল্যায়ন আজও বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য (Sing, J. 30, Viswanathan, G-32)।

তারপর তিনি বলছেন, "আজ আমরা ক্রমশ বুঝতে পারছি, ইংরেজী ভাষা, পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান বিস্তারের অর্থই ছিল গ্রেট ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লবজাত দ্রব্যের ভারতীয় বাজারের বিস্তৃতি, সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি, তার সমর্থক নতুন এক মধ্যশ্রেণীর সৃষ্টি এবং ভারতীয় হস্ত ও কুটির শিল্পের ক্রমবিনষ্টি।" (ivq7:14,R. Phillipson 36)। তারপরেও তিনি বলেন, "তবু, এত পঙ্গুতা ও বিকৃতি, এত অসম্পূর্ণতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের সার্থকতা ও চরিতার্থতা কিছু তুচ্ছ করবার মতো নয়। "(রায় ৭:১৪)। উনিশ শতক বাংলাদেশের তথা ভারতের জন্য এক ব্যতিক্রমী শতক। দেশটি তখন ইংরেজের দখলে। ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি ও সংস্কৃতির সঙ্গে ইউরোপ থেকে আগত পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও বুর্জোয়া সংস্কৃতির এক সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও ধর্মীয় অবক্ষয় বাংলাদেশ ও ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতাকে ব্যঙ্গ করছে। ধর্মান্ধতা এমন এক পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে ধর্মের নামে যেসব অমানবিক আচার-অনুষ্ঠান সমাজকে প্রায় পঙ্গু করে রেখেছিল, নবউত্থিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী তার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছিল। রামমোহন রায় ও তাঁর কতিপয় বন্ধু ও সঙ্গী সে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। অন্যদিকে প্রায় ছ'শ বছর মুসলিম শাসনের ফলে ইসলামের সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির যে মেলবন্ধন ঘটেছিল এবং ইসলাম ধর্মকে অনেকটাই উদার করে তুলেছিল, সংস্কার আন্দোলনের নামে ঐসব ভারতীয় উপাদানগুলো দূর করে ইসলামকে চৌদ্দ'শ বছরের পূর্বের মূলে ফিরিয়ে নেবার এক পশ্চাদমুখী আন্দোলনে পরিচালিত হয়েছিল। ধূর্ত ইংরেজ শাসকবৃন্দ ওই অবস্থাটাকে ভালভাবেই তাদের পক্ষে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছিল। হিউমের অভিজ্ঞতাবাদ ও বেছানের উপযোগবাদ উঠতি হিন্দু মধ্যশ্রেণীর মধ্যে এক বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক মনোভাব সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু সে সময়ে মুসলমান উচ্চবিত্ত-অভিজাত শ্রেণীকে তা নাড়া দিতে পারে নি, কারণ মুসলমানদের মধ্যে তখনও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান ঘটেনি। তাই হিন্দু মধ্য ও উচ্চবিত্ত শ্রেণী ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি অনেক বেশী মনোযোগী হয়ে ওঠেন। অন্যদিকে মুসলিম আলেম সম্প্রদায় ইংরেজী ভাষাকে বিজাতীয় ভাষা বলে তাকে হারাম ঘোষণা করেন যা মুসলমানদের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পর্কে দুই সম্প্রদায়ের দু'রকমের মনোভাব তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পার্থক্য ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে তোলে।

১৭৯৩ সালে চার্লস গ্রান্ট সেই সুযোগটাই গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। ইংরেজী ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দেবার প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু সেই সময় লন্ডনে বসে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে কোর্ট অব ডাইরেক্টরস তা নাকচ করে দিলেও ১৮৩৫ সালে মেকলে ও বেন্টিংকের হাতে তা বাস্তবায়িত হয়। সেই সময় পাদ্রী উইলিয়াম এডাম তাঁর পর্যবেক্ষণমূলক যে বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিগ্রাহ্য শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছিলেন, তাকে 'জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন' 'অবাস্তব' বলে হেলায় সেলফে তুলে রেখে দেয়। আশ্চর্যের হলেও সত্যি, বাংলাদেশের এক বিরাট শিক্ষিত অংশ আজও গ্রান্ট ও মেকলের 'নাবালক মানসপুত্রই রয়ে গেছেন। তাঁরা ইংরেজী ভাষার অর্থকরী শক্তির প্রতি এতটাই আসক্ত যে নিজেদের শিশু-সন্তানদের মুখে বাংলা ভাষার বদলে ইংরেজী ভাষা চাপিয়ে দিতে চান। তাই বাংলাদেশে আজ ইংরেজী মাধ্যমের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এরকম বিস্তার। এদেশের শিক্ষিত মানুষের একাংশ আজও জানেন না যে গণশিক্ষা বা প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষার স্থান কোথায়? গ্রান্ট, মেকলে, রামমোহন, বঙ্কিমের ভুলটি আজও আমাদের কাঁধে। খোলনলচে পাল্টে তাঁরা পুরোপুরি পশ্চিমী মডেলে এদেশে শিক্ষার প্রসার চেয়েছিলেন। দেশজ শিক্ষাধারাকে তাঁরা সবদিক দিয়েই অকেজো মনে করতেন। কারণ তাঁরা প্রধানত দেশের উপরতলার লোকের শিক্ষা নিয়েই বেশী মনোযোগী ছিলেন। এই অবস্থায় এডামের শিক্ষা রিপোর্টটি আজও আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনার কাজ করতে পারে। এডামের ন্যায় দূরদর্শী শিক্ষা-দার্শনিক আজও আমাদের সমাজে জন্মগ্রহণ করল না, এর চেয়ে বড় লজ্জার আর কি আছে! আমি তাই এডামের রিপোর্টের সুপারিশমালা নিয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করবো।

এডাম এদেশের মানুষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশে তাদের মাতৃভাষা বাংলা ভালভাবে রপ্ত করেন। ফলে এদেশের মানুষের মনোভাব, আচার-আচরণ, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধর্ম বিশ্বাস ও ঐতিহ্যিক কল্প-কাহিনীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এতে তাঁর প্রত্যয় জন্মে যে, ধর্মের সঙ্গে সংঘাতমূলক নয়, এমন যেকোনো জ্ঞান শিখতে তাদের আপত্তি নেই যদি সরকারী সাহায্যে সেগুলো পরিচালিত হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি দেশের সাধারণ মানুষের আগ্রহ লক্ষ্য করেন তিনি এবং সিদ্ধান্তে আসেন সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী কিংবা ইংরেজী কোনো ভাষার মাধ্যমেই সে শিক্ষা তাদের

কাছে পৌঁছানো যাবে না। কারণ এর কোনটিই এদেশের মানুষের মাতৃভাষা নয়। সংস্কৃত-স্কুল সম্পর্কে তাঁর অভিমত এই যে, "There is not any mutual connection or dependence between Vernacular and Sanscrit school. Brahmans monopolize not only a part but nearly the whole of Sanscrit learning." (Adam 1: 273-274)। ফার্সী ও আরবী স্কুল সম্পর্কে তাঁর একই সিদ্ধান্ত। তিনি বলেন শিক্ষার্থীরা হিন্দু অথবা মুসলমান যাই হোক না কেন, এসব স্কুল সমাজের উঁচু শ্রেণীর জন্যে: "Both languages are foreign and both classes of schools are inaccessible to the body of the people." (Adam 1: 292)। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন এসব পৌরাণিক ও বিদেশী ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় জ্ঞান দেশের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানো যাবে না। তাই ১৮২৯ সালে তিনি লর্ড বেন্টিংককে একখানা পত্রে জানান যে এ দেশে যেকোন ধরনের শিক্ষা সংস্কারের আগে সুদীর্ঘকাল ধরে চলে আসা শিক্ষা কাঠামোর উপর একটি অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন তৈরী করা উচিত হবে। এ ছাড়া একটি সার্বিক শিক্ষা-সংস্কার সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁর সে আবেদনটি সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হয়। ১৮৩৪ সালে শিক্ষার প্রাচ্য ও প্রতীচ্যবাদীদের তর্কবিতর্ক চরম আকার ধারণ করে এবং বেন্টিংক মেকলেকে দ্রুত তার সমাধানের জন্য চাপ দেন, তখন এডাম পুনরায় তাঁর প্রস্তাবটি পেশ করেন। এদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার ওপর গবেষণামূলক একটি প্রতিবেদনের গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "to know what the country needs to be done for it by Government, we must first know what the country has done and is doing for itself." (Adam 1 Report p.1)। এবারে তিনি সাফল্যের মুখ দেখেন। তাঁর প্রস্তাবটি বিস্তারিত আলোচনার পর লর্ড বেন্টিংক তা গ্রহণ করেন। এডামকে তাঁর প্রস্তাবটি বিস্তারিত লিখে জমা দিতে বলেন। ১৮৩৫ সালের ২ জানুয়ারী এডাম গভর্নর জেনারেলকে একটি লিখিত প্রস্তাব দেন। ১৮৩৫ সালের ২০ জানুয়ারী লর্ড বেন্টিংক মাসে এক হাজার টাকা বেতনে বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা সরেজমিনে খুঁটিয়ে দেখার জন্য এডামকে কমিশনার পদে নিয়োগ দেন এবং তাঁকে জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশানের অধীনে ন্যস্ত করেন। বেন্টিংক এডামের কথার প্রতিধ্বনি করে বলেন, "There is one very material fact still wanting to be known, the actual state of Native education, that is, of that which is carried on, as it probably has been for centuries, entirely under Native management" (Adam : Introduction lxiv)। তিনি স্বীকার করেন এদেশে স্থানীয় উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় শত শত বছর ধরে একটি দেশজ শিক্ষার কাঠামো চলে আসছে, যার সম্পর্কে তাঁরা তেমন কিছু জানেন না। এই স্বীকৃতির মাধ্যমে তিনি এডামের অনুসন্ধানের গুরুত্ব বাড়িয়ে তোলেন এবং বলেন এডাম এ কাজের জন্য 'peculiarly qualified' ব্যক্তি। এডাম সম্পর্কে তিনি আরো বলেন যে, ১৭ বছর আগে একজন ধর্মপ্রচারক হিসেবে তিনি ভারতে আসেন এবং পরে তিনি ইন্ডিয়া গেজেট নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। "With considerable ability he possesses great industry and a high character of integrity." এদেশের ভাষা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান এবং এদেশের মানুষের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা করার অভ্যাস তাঁকে এ কাজের জন্য যথোপযুক্ত ব্যক্তি হিসেবে যোগ্যতা দান করেছে। বেন্টিংক-এর কথায় "His knowledge of the languages and his habits of intercourse with the Natives, give him peculiar advantage for such an enquiry" (Adam 1: 1xvii)।

নিয়োগ পেয়ে এডাম তাঁর কাজ শুরু করেন। তিন বছর তিনি বাংলা বিহারের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরে বেড়ান। তিনি এদেশের মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশেন। তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। শিক্ষার বাস্তব অবস্থা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। অত্যন্ত পরিশ্রম ও কষ্টের সাথে তিনি দলিলপত্র, পরিসংখ্যান, স্কুল ও ছাত্র-শিক্ষকের সুবিধা-অসুবিধাগুলো সহানুভূতির সঙ্গে বিশ্লেষণ করেন এবং তিন খণ্ডের বিশাল এক রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। প্রায় সবাই সেই রিপোর্টটিকে 'One of the ablest Reports ever written in India' বলে মনে করেন। জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশনের প্রেসিডেন্ট মেকলের কাছে তিনি রিপোর্টটি জমা দেন। রিপোর্টটি সম্পর্কে মেকলে বলেন, "the best sketches on the state of education that had been submitted before the public" (Adam 1: xxiv)। বিভিন্ন সময়ে তিনি তিনটি রিপোর্ট জমা দেন। ১৮৩৫ সালের ১ জুলাই তিনি প্রথম রিপোর্টটি জমা দেন। দ্বিতীয় রিপোর্টটি জমা দেন ১৮৩৫ সালের ২৩ ডিসেম্বর এবং তৃতীয়টি ১৮৩৮ সালের ২৮ এপ্রিল।

বেন্টিংক ১৮৩৫ সালের ২০ জানুয়ারী এডামকে ওই অনুসন্ধানের সরকারী দায়িত্ব দেন; এডাম প্রথম রিপোর্টটি জমা দেন ১৮৩৫ সালের ১ জুলাই। কিন্তু অবাক হলেও সত্যি বেন্টিংক এডামের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা না করে ৭ মার্চ ১৮৩৫ মেকলে প্রদত্ত প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেন। এডামের প্রথম রিপোর্টটি জমা দেবার কয়েক মাস আগে মেকলের শিক্ষানীতি অনুমোদন করা নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন দেখা দেয়। এডাম সম্পর্কে বেন্টিংক ও মেকলের উপযুক্ত উক্তির কথা মনে করলে তাঁর রিপোর্টটি উপেক্ষা করার কোনো যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। অনুমোদন দেবার পর আর কোন কথা বলার অবকাশ থাকে না। তবু গভর্নর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিংক উইলিয়াম এডামকে অনুসন্ধান চালিয়ে রিপোর্ট প্রণয়ন নিষেধ করেন নি। এডাম তারপরও কোম্পানীর বেতনভূক কমিশনার হিসেবে তিন বছর অনুসন্ধান কাজ চালিয়ে যান। কেন? উইলিয়াম এডামের অসাধারণ রিপোর্টের কোনোই মূল্যই ছিল না গভর্নর জেনারেল বেন্টিংক ও মেকলের কাছে। অথচ এঁরাই উইলিয়াম এডাম ও তাঁর রিপোর্টের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। তাই প্রশ্ন জাগে ৭ মার্চের সিদ্ধান্তই কি বেন্টিংকের শেষ কথা ছিল? তাই যদি হবে, তাহলে তিনি এডামের কাজ বন্ধ করলেন না কেন? আরো প্রশ্ন ওঠে মেকলে কি তাঁর রিপোর্ট স্বাক্ষর করতে গভর্নর জেনারেলকে বাধ্য করেছিলেন? তেমন ইঙ্গিতই পাওয়া যায় মল্লিকের বইতে। India Public Consultations-এর সূত্র উল্লেখ করে মল্লিক জানান, "Finally he (Macaulay) winded up his minute by a threat of resignation if his suggestions were not

accepted...Bentinck gave his final approval. But no official decision in the form of a resolution was adopted, the debate on the question still continued". (Mallik 8 : 227)। আশ্চর্য হলেও সত্যি এতবড় একটা পরিবর্তন ঘটে গেল কোন রকম লিখিত সিদ্ধান্ত ছাড়া। হ্যাঁ, মেকলের ওই রিপোর্টটি গ্রহণ করার পরও এডামের সে প্রতিবেদন নিয়ে বিতর্ক শেষ হয়নি। এ দেশের শিক্ষা নিয়ে পরবর্তী ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দেবে। ১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জের ১০১টা বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং ১৮৫৪ সালে উডের ডেসপাচে 'নিম্ন পরিস্রাবণ নীতি' বর্জিত হওয়া তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বাংলা তথা ভারতের জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষে এডাম যে তথ্যপ্রমাণসহ যুক্তি তুলে ধরেছিলেন, পরবর্তীতে কেউ-ই তাঁর সে সুপারিশের গুরুত্ব অস্বীকার করতে পারে নি। ১৮৭২ সালে হওয়েল মেকলের নীতি সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে আজ সবাই সে নীতিকে ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে করে : "conducted on a system now universally admitted to be erroneous. (Howell 9 : 1)।

মেকলে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার এক স্থায়ী রূপ প্রদান করেন যা দেশের গতরখাটা মানুষের বিরুদ্ধে। মুষ্টিমেয় কিছু ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য রচিত শিক্ষা পদ্ধতিটি আমরা আজও ভাঙতে পারলাম না। উক্ত বইতে হওয়েল আরো বলেন, "The rejection of Adam's plan gave the deathblow to the prospects of the indigenous schools of Bengal" (Howell 9:32)। পরবর্তী গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ড সিদ্ধান্ত পুনঃবিচারের ঝুঁকি নিতে চান নি এবং জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন, মেকলে যার সভাপতি, এডামের রিপোর্টকে 'অবাস্তব' বলে শেলফে তুলে রাখে। সরকার শিক্ষার প্রাচ্যনীতি থেকে ১৮০ ডিগ্রী ডিগবাজি দিয়ে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রদানের নীতি দেশবাসীর ওপর চাপিয়ে দেয়। ১৮৩৯ সালের ২৪ নভেম্বরের মিনিটে লর্ড অকল্যান্ড বলেন, "When Mr. Adam enforces his views for the poor and the ignorant, those who are too ignorant to understand the evils of ignorance and too poor, even if they did, to be able to remove them the inference irresistibly presents itself that among these is not the field in which our efforts can at present be more successfully employed." (Basak 2:292) অকল্যান্ড তাই মেকলের কথার প্রতিধ্বনি করেন, "the first step must be to diffuse wider information and better sentiments amongst the upper and middle classes" (Basak 2:292)। ব্রিটিশকে তাড়িয়ে আমরা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলাম। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র ভেঙে আমরা 'বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা করেছি। কিন্তু, আজও আমরা মেকলে, বেন্টিংক, অকল্যান্ডের চাপিয়ে দেয়া বাঙালী বিরোধী শিক্ষা নীতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারি নি। আমরা আজও তাঁদের প্রদর্শিত পথ ধরে ওই বৈষম্যমূলক শিক্ষানীতি সরকারী ও বেসরকারীভাবে বহন করে চলছি।

(এরপর পড়তে দেখুন পৃষ্ঠা নং ১৮)

বোর্ডের অনুমোদন ব্যতিরেকেই বিভিন্ন স্থানে মাতৃভাষার স্কুলগুলোতে মাতৃভাষার পাশাপাশি ইংরেজী শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়, একান্তই ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্কুলগুলো চালু রাখার স্বার্থে। সরকার নীতিগতভাবে সমর্থন না করলেও ইংরেজী ক্লাস বন্ধ করে দেয় নি। বাংলা স্কুলগুলোতে মাতৃভাষার সাথে ইংরেজীও শেখানো হতে থাকে। ছাত্রদের ঝোঁক ইংরেজী শেখা। সরকার শুধু বলে ইংরেজী যেন দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে পড়ানো হয়। ইংরেজী ভাষার কোনো পরীক্ষা নেওয়া যাবে না। কিন্তু ইংরেজী ভাষার প্রতি মানুষের আসক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য যা করণীয় সরকার তা সবই করে। কারণ কলকাঠি নাড়ার একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী ব্রিটিশ সরকারই

# পল্লী পাঠাগারের কথা

কাকলী খাতুন

‘মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেউ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সে নীরব মহাশব্দের সহিত এই পাঠাগারের তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে। মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে।’ - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুস্থ সুন্দর ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে পাঠাগারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। পাঠাগার হলো সমাজ উন্নয়নের বাহন। পাঠাগার অতি সহজেই ইতিবাচক ব্যক্তি সমাজ ও জাতি গঠন করতে পারে। পাঠাগার যেহেতু জ্ঞানের ভাণ্ডার তাই এটি জ্ঞাননির্ভর সমাজ গঠন করতে সক্ষম। এজন্য সমাজে পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক।

বর্তমানে আধুনিকায়ন ও তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে ইন্টারনেট সুবিধার আওতায় এসেছি আমরা সবাই। এর যেমন সুফল রয়েছে তেমনি কুফলও রয়েছে। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের তরুণ সমাজ। তরুণ সমাজ ও নতুন প্রজন্মকে অপসংস্কৃতি, অপরাধ, মাদকাসক্তি, কিশোর অপরাধ, র‍্যাগিং, বুলিংসহ নানা অপরাধ হতে রক্ষা করতে সমাজে পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

আমাদের শিক্ষক, অভিভাবক ও সচেতন মহল সবার লক্ষ্য হওয়া উচিত ছেলেমেয়েরা যাতে বই পড়া ও সুস্থ সংস্কৃতির চর্চার মধ্য দিয়ে একটি উন্নত ও আলোকিত দেশ তৈরি করতে পারে। আমাদের দেশে পাঠাগারের উপযোগিতা উন্নত দেশগুলোর চেয়েও বেশি।

বই যেমন চরিত্র গঠনে সহায়তা করে সৎ গুণাবলীর অনুশীলনেও তেমনি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বইয়ের সাথে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। একটি সমাজের রুপরেখা বদলে দিতে পারে একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার। তাই সমাজে নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ ও জাতির উন্নয়নে প্রতিটি গ্রামে, পাড়ায় বা মহল্লায় একটি করে পাঠাগার গড়ে তোলা অতি জরুরি।

**পল্লী পাঠাগারের যাত্রা শুরু**

মহান স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কিছু উদ্যমী তরুণ ২০০৮ সালের ২৮ এপ্রিল পাবনার আটঘরিয়া উপজেলার চাঁদভা ইউনিয়নের সড়াবাড়িয়া বাজারের উপকণ্ঠে মিয়াপাড়া গ্রামে প্রতিষ্ঠা করে পল্লী পাঠাগার। অনানুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় আগে। এক ঝাক তরুণ ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে পল্লী পাঠাগারকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। কিছু আলোকিত মানুষ এবং এলাকার সর্বস্তরের মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠানটি অদ্যাবধি তার কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। একজন ব্যক্তির কথা না বললেই নয়। তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জনাব আফছার উদ্দিন মোল্লা। প্রতিষ্ঠার শুরুতেই তিনি তার একটি আধা পাকা ঘর পল্লী পাঠাগারের জন্য ছেড়ে দেন। এরপর ২০০৯ সালে পাঠাগারের নামে মিয়াপাড়া মৌজায় ৩ শতাংশ জমি দান করেন। তৎকালীন সংসদ সদস্য মাননীয় ভূমিমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুর রহমান শরীফ ডিলু মহোদয়ের জোরালো সুপারিশে ২০১১ সালের ২৪ এপ্রিল সমাজসেবা অধিদপ্তর পাবনা কর্তৃক পাঠাগারটি নিবন্ধন লাভ করে যার নম্বর ১০৯১/২০১১। সম্পূর্ণ অ-রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ৩টি মূল নীতির উপর ভিত্তি করে সংগঠনটি পরিচালিত হয়ে আসছে: ক. শিক্ষা খ. সংস্কৃতি ও গ. প্রগতি।

**লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:**

ক) এলাকার শিক্ষিত সমাজকে সাংগঠনিকভাবে ঐক্যবদ্ধ রাখা।

খ) এলাকার মানুষের পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে সহায়তা ও প্রচেষ্টা চালানো।

গ) এলাকার গরীব ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক ও আর্থিক সহায়তা প্রদান।

ঘ) অর্থের সংকুলান সাপেক্ষে ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান।

ঙ) কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করা।

চ) সামাজিক বিভিন্ন অসংগতি, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, নারী ও শিশু নির্যাতন, দুর্নীতি, মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ইত্যাদি দূরীকরণে সভা-সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।

ছ) নিয়মিত সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি ও বিশ্ব সাহিত্য প্রসারে ভূমিকা রাখা। বিভিন্ন জাতীয় দিবস যথাযথ মর্যাদায় পালনের মাধ্যমে নাগরিক দায়িত্ব পালন করা ইত্যাদিকে সামনে রেখে পল্লী পাঠাগার তার কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

এছাড়াও পল্লী পাঠাগারের আরেকটি বিশেষ কার্যক্রম হলো বৃক্ষরোপণ ও রক্তদান কর্মসূচি। এ বছরে পল্লী পাঠাগার প্রায় ৩ হাজার তালের বীজ রাস্তার দুই পাশে রোপণ করেছে। বর্তমানে অনলাইনে যোগাযোগ ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পল্লী পাঠাগার পরিবার নামে পাঠাগারের একটি ফেসবুক আইডি রয়েছে।

পল্লী পাঠাগার বর্তমানে নিজস্ব কার্যালয়ে তার সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। পল্লী পাঠাগারে সংগৃহীত বইয়ের সংখ্যা প্রায় ৩ হাজার।

পাঠাগারে প্রতিদিন গড়ে ২০–২৫ জন পাঠক আসে। তবে পাঠাগারটিতে নিবন্ধিত পাঠকের সংখ্যা প্রায় ৪০০ জন।

পাঠাগারটির স্থায়ী সদস্য সংখ্যা ৪৯ জন এবং ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যকরী পরিষদ রয়েছে। ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ রয়েছে। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ১৬ জন এবং সাধারণ পরিষদের সদস্য ১১ জন।

পল্লী পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি সড়াবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক জনাব আব্দুল কাদেরের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে জানতে পারি, পাঠাগারটির ইতিহাস ও পাঠাগার নিয়ে তার মন্তব্য। তিনি জানান, গ্রামের অধিকাংশ মানুষের শিক্ষার অভাব ও তাদের জীবনযাত্রার মান নিম্ন। অবসর সময় পেলেই বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে তারা চায়ের দোকানে আড্ডা বা টিভি নিয়ে বসত। এখানে ১টি প্রাথমিক ও ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৮০০। আবার স্কুল ছুটির পর ছাত্রদের বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ করতে দেখা যায়, ইন্টানেটের অপব্যবহার তার মধ্যে অন্যতম। তাই তিনি এখানে একটি পাঠাগার স্থাপনের কথা ভাবেন। অনেকেই বলেছেন, পাঠাগার করে লাভ কী? এ থেকে কোন আর্থিক সচ্ছলতা আসবে না। আরো অনেক কিছু। কিন্তু তিনি থেমে যাননি। গ্রামের কিছু শিক্ষিত যুবক

তার এই মহান উদ্যোগে তার সাথে থেকে পাঠাগার তৈরিতে সহযোগিতা করেছেন। প্রথমে একটি ঘরের বাইরের বারান্দায় একটি ছোট আলমারিতে ৫০টি বই নিয়ে যাত্রা শুরু। একদিন বৃষ্টিতে সব বই ভিজে যায় কারণ আলমারিতে গ্লাস ছিল না। সে বইগুলো রোদে শুকিয়ে আবার যত্ন করে রাখা হয়। প্রথমে পাঠক ছিল না। তিনি এলাকার শিক্ষিত যুবকদের নিয়ে আশেপাশের স্কুলে, কলেজ ও বাজারে গিয়ে পাঠাগারে আসার নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বর্তমানে পাঠাগারটি সমৃদ্ধ। তিনি জানান, জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের এই অবারিত অঙ্গনে সবার নিমন্ত্রণ। বিনামূল্যে যে কেউ এখানে বসে বই পড়তে পারেন স্বাচ্ছন্দ্যে।

গ্রামের মধ্যে এই পাঠাগারটি তৈরি হওয়াতে সবাই উপকৃত। বিশেষ করে তরুণ সমাজ ও নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা জানায়, এখানে প্রায় সব ধরনের বই আছে। ফলে আমরা পছন্দমতো বই পড়তে পারি। পাঠাগারে সময় দেওয়াতে সমাজের অনেক অসামাজিক ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকতে পারি। এই সুচেতনার পরিসর আরো ছড়িয়ে যাক ও তাদের সেবার মান আরো বৃদ্ধি পাক এমনটাই প্রত্যাশা পাঠাগারটিতে পড়তে আশা পাঠক-পাঠিকাদের।

এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ বলেন, পাঠাগারটির অবস্থান পাড়া বা স্থানীয় বাজারের পাশেই হওয়াতে শুধু ছাত্রছাত্রী নয় সব বয়সের মানুষই সেখানে যায়। একটা সময় দেখা যেত বয়স্ক মানুষগুলোও চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দিত। কিন্তু এখন বিকেল হলেই অনেককে দল বেঁধে ঢুকতে দেখা যায় পাঠাগারটিতে। সব বয়সের মানুষের জ্ঞানচর্চার ও মিলনমেলার সমাবেশস্থল যেন এই পল্লী পাঠাগার। পাঠাগার তৈরি হওয়াতে সমাজে অসামাজিক ও অপরাধমূলক কাজের প্রবণতা কমেছে। এই এলাকায় একটি সুস্থ সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজমান রয়েছে। পাঠাগারটি হলো কোলাহলমুক্ত এক নীরব জ্ঞানসমুদ্র।

দেশ ও জাতির অগ্রগতির ক্ষেত্রে পাঠাগার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমরা সবাই চাই একটি সুন্দর সমাজ। সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন করতে হলে জ্ঞানবিজ্ঞানে ও শিল্প-সাহিত্যে আমাদের সমৃদ্ধ হতে হবে এবং প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। গত এক যুগে পল্লী পাঠাগারের অর্জন গর্বের বলা যায়।

*লেখক: সিদীপের শিক্ষাসুপারভাইজার, দেবোত্তর ব্রাঞ্চ, পাবনা*

## চাঁদপুর সদর উপজেলায়

# নদী ভাঙ্গন: জীবিকা সংকট ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। দেশের ভূ-প্রকৃতি ও ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে প্রতি বছরই আমাদের দেশে দুর্যোগ নেমে আসে। বাংলাদেশে নদীভাঙন একটি স্থানীয় এবং পুনরাবৃত্ত প্রাকৃতিক বিপদ। বাংলাদেশে প্রায় ১.৫ থেকে ২ কোটি মানুষ ভাঙনের ঝুঁকিতে রয়েছে এবং প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ ৯৪টি উপজেলায় বাস করে যেগুলি প্রতি বছর নদীভাঙনের দ্বারা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক রিপোর্ট অনুযায়ী, ৫০০ কিলোমিটার নদীতীর মারাত্মক ভাঙনের ঝুঁকিতে রয়েছে। দেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে নদীতীর ক্ষয় বিশেষভাবে সাধারণ, যার ফলে এই অঞ্চল অর্থনৈতিকভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে। প্রতি বছর নদীভাঙনের কারণে প্রায় ৯০০০ হেক্টর বসতবাড়ি এবং কৃষি জমি ধ্বংস হয়, প্রায় দুই লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয় যা খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এবং দরিদ্রতার সৃষ্টি করে। নদীভাঙন বাংলাদেশের অন্যতম পরিবেশগত বিপর্যয়ের একটি। এটি শুধুমাত্র পরিবেশকে প্রভাবিত করে না, বরং সামাজিক জীবিকার ধরনকেও প্রভাবিত করে। বাংলাদেশে নদীতীর ক্ষয়, অত্যধিক বৃষ্টিপাত (বিশেষ করে উজানে) এবং বর্ধিত জলপ্রবাহের কারণে বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নদীভাঙনের গতি সম্প্রতি নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যার পরিণতি দ্রুত নদীতীর ধস।

জীবিকা দৈনন্দিন অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় এবং বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপকে বোঝায় যা সারা জীবন জুড়ে পরিচালিত হয়। নদীতীর ভাঙনের কারণে নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষের জীবন-জীবিকা প্রায়শই পরিবর্তিত হয়। আবার, ঝুঁকির মাত্রা অবাঞ্ছিত ঘটনার সম্ভাবনা এবং অবাঞ্ছিত ঘটনার সম্ভাব্য পরিণতি প্রতিফলিত করে। নদী ভাঙ্গনের কারণে স্থানীয় জনগণের জীবন-জীবিকা

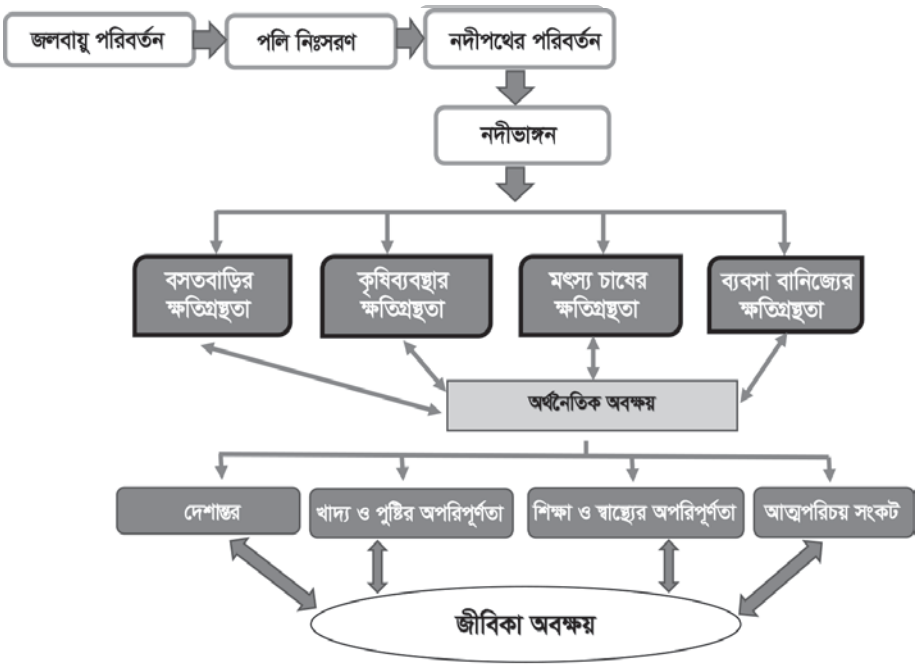


ফিগারঃ জলবায়ু পরিবর্তনের মাধ্যমে জীবিকা অবক্ষয়ের প্রক্রিয়া

ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় এসে ব্যাহত হচ্ছে। ঘন ঘন ভাঙনের ফলে ভূমি ও গৃহস্থালির ক্ষতি, কৃষি ব্যর্থতা, মাছ উৎপাদনের ক্ষতি, স্থানীয় বাণিজ্য ইত্যাদির ক্ষতি হয়।

পার্টিসিপেটরি রুরাল এপ্রাইজাল মেথোড এবং মাল্টি স্টেজ স্যাম্পেলিংয়ের মাধ্যমে চাঁদপুর সদর উপজেলার মোট ৫০ জন নদী উপকূলীয় মানুষের সাথে কথা বলে জানা যায়, বিগত কয়েক দশকে নদীভাঙ্গনের কারণে সবচেয়ে বেশি মানুষ দেশান্তরের শিকার হয়। তাদের অর্থনৈতিক বা আর্থিক অবস্থা পূর্বে স্থির ছিল, তবে নদীভাঙ্গনের কারণে, তারা সমস্ত সম্পত্তি এবং স্বত্বাধিকার হারিয়ে ফেলেন। নদীর কাছাকাছি অবস্থিত মানুষরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক অনিশ্চয়তা এবং পুষ্টিহীনতায় ভুগছেন। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ভবিষ্যতের দুর্যোগ হ্রাস করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিশেষত নিরাপত্তাহীনতা নদীতীরকে জোরপূর্বক স্থানচ্যুত করার কারণে সৃষ্ট। প্রারম্ভিক সতর্কতা ব্যবস্থা ঝুঁকি কমাতে পারে, কারণ মানুষ যখন কোনো বিপর্যয়কর পরিস্থিতির জন্য সচেতন হতে পারে, তখন তার সমস্যা সহজেই সমাধান করতে পারে। নদী ভাঙ্গনের কারণে জীবিকা নির্বাহের ধরণ পরিবর্তন করা উচিত এবং এই কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

*লেখক: মাহবুবুর রশীদ অরিস, জুনিয়র অফিসার, মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রাম, সিদীপ*

# এনজিওতে আপনি কেন চাকরি করবেন

মোঃ সেলিম উদ্দীন

**ভুমিকাঃ** বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের সমস্যা অনেক বড় সমস্যা বলেই সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু আমি দেখি অনেক শিক্ষিত বেকার যুবক ঘুরে বেড়ায়। অথচ এনজিওতে চাকরি পেলেও এক বা দু'মাস পরে চাকরি ছেড়ে চলে যায়। অনেকে যোগদানের পরের দিনই না বলে চলে যায়। সে বিবেচনায় আমার কাছে মাঝে মাঝে মনে হয় আসলে সমস্যা কী কর্মসংস্থানের না কর্মকে কর্ম হিসেবে মেনে না নেওয়ার মানসিকতার?

**কাজের ক্ষেত্রসমূহঃ** এ দেশে এনজিওগুলো প্রধানত স্বাস্থ্যসচেনতা, শিক্ষা, স্যানিটেশন, নারী, মানবাধিকার, শিশু প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কাজ করে। দেশের সার্বিক অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি মানবসম্পদের উন্নয়নের জন্য সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং অনেক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বা এনজিও কাজ করে যাচ্ছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে ত্রাণ ও পুনর্বাসন নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে এর ব্যাপ্তি বেড়েছে অনেক। এ দেশে এনজিওগুলো প্রধানত প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, স্বাস্থ্যসচেতনতা, শিক্ষা, মৌলিক অধিকার, স্যানিটেশন, আর্সেনিক, এইচআইভি/ এইডস, নারী, মানবাধিকার, শিশু, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠী, ক্ষুদ্রঋণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কাজ করে। সেক্ষেত্রে মূলত কয়েকটি নির্ধারিত পদ বাদে অন্য ক্ষেত্রগুলোয় চাকরি পাওয়ার জন্য পড়াশোনার বিষয় নিয়ে বাঁধাধরা কোন নিয়ম নেই। এনজিও গুলোয় বিষয়ভিত্তিক কয়েকটি ভাগ রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে গবেষণা, উন্নয়ন, প্রকল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবিভাগ, মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ, হিসাবরক্ষণ বিভাগ প্রভৃতি। একেক বিষয়ে কাজ করার যোগ্যতা আলাদা। মাঠ পর্যায়ের কাজের ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞান, সমাজকল্যাণ, নৃবিজ্ঞান, লোকপ্রশাসন, অর্থনীতি, উন্নয়ন অধ্যয়ন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে ডিগ্রিধারীরা বেশি প্রাধান্য পান। এনজিওর নিজস্ব হিসাববিভাগ ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের জন্য বাণিজ্য অনুষদের শিক্ষার্থীরাও অগ্রাধিকার পান। প্রশাসন, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় বিবিএ ও এম বিএ ডিগ্রিধারীদের চাহিদা বেশি। এ ছাড়া বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে চিকিৎসক ও প্রকৌশলীদেরও কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

**এ পেশার সৃজনশীলতাঃ** সৃজনশীলতা মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর অন্যতম যা মানুষকে নিজে থেকে কিছু করতে, তৈরী করতে বা আবিষ্কার করতে সাহায্য করে।

*বার্ষিক শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলনে বক্তব্য দিচ্ছেন লেখক*

যেকোন এনজিওতে কর্মরত একজন কর্মীকে মানুষের কল্যাণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করতে হয়। তাই নিজের ইচ্ছা আর সেবার মানসিকতা থাকাটা এ পেশার জন্য খুবই জরুরি। এছাড়া প্রয়োজনে প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চলে গিয়ে কাজ করার জন্য সার্বক্ষণিক ভাবে মানসিক প্রস্তুতি থাকতে হবে। পড়াশোনার পাশাপাশি মানুষের সঙ্গে সহজে মিশতে পারা, অন্যকে বোঝানোর ক্ষমতা, ধৈর্যশীল হওয়া, উপস্থিত বুদ্ধি, উন্নয়ন কাজে অভিজ্ঞতা, সৃজনশীলতা, নিষ্ঠা, ভাষাগত দক্ষতা, প্রযুক্তিগত ধারণা,

দায়িত্বশীল ও পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে এমন গুণাবলি বেশি প্রাধান্য পেয়ে থাকে এনজিও পেশাতে। এনজিওতে কাজের ধরণ অন্যান্য সেক্টরগুলো থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। এ পেশায় আসার আগে আপনাকে মানসিকভাবে ঠিক করে নিতে হবে যে, আদৌ এ পেশাটি আপনার জন্য উপযুক্ত কিনা। এখানে প্রতিটি কর্মীকে মানুষের কল্যাণে কাজ করতে হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে। তাই এনজিওতে আপনি কেন কাজ করবেন তা নির্ভর করে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ইচ্ছা আপনার কতটুকু তার উপর। এছাড়াও নিজের ক্যারিয়ার গড়ার সহায়ক উপাদান হিসেবে এনজিওতে কর্মরত অবস্থায় আপনি বিভিন্ন ধরণের সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকবেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের সুযোগ থেকে আপনি সে সকল অঞ্চলের মানুষ এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারবেন একেবারে কাছ থেকে। সর্বোপরি দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিতদের উন্নয়নমূলক কাজে সরাসরি নিজেকে নিয়োজিত করতে পারবেন।

**এ পেশার বৈচিত্র্যঃ** অন্যান্য সেক্টরগুলোর তুলনায় এনজিওতে চাকরির পরিবর্তন খুব ঘন ঘন করার সুযোগ থাকে। সাধারণত এই ধরণের পরিবর্তন এন্ট্রি লেভেল থেকে মিড লেভেল পর্যন্ত হয়। তবে উঁচু পজিশনে এটি খুব একটা দেখা যায়না। 'প্রজেক্ট ভিত্তিক কাজ' হওয়ার কারণে মিড লেভেল এবং এন্ট্রি লেভেলে চাকরি পরিবর্তনের হারটি তুলনামূলক বেশি। তবে এই ধরণের পরিবর্তন একজন কর্মীকে নানা অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দিয়ে থাকে যা পরবর্তীতে তার ক্যারিয়ার গড়তে সাহায্য করে। এইচআর/এডমিন/অ্যাকাউন্টস ইত্যাদি পদে কর্মরতদেরও কাজের ক্ষেত্র যেহেতু অন্যান্য সেক্টর গুলোর মতোই, তাই এই পদে থাকা কর্মীরা খুব সহজেই প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করে অন্য কোথাও চাকরি নিতে পারেন। যারা এনজিওর কোন প্রজেক্টে কাজ করেছেন, তারাও ভবিষ্যতে অন্য প্রতিষ্ঠানে কাজ নিতে পারেন। এনজিওতে দেশের বিভিন্ন স্থানে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জনের পাশাপাশি দেশের বাইরেও কাজ করার বা প্রশিক্ষণ অর্জন করার অভিজ্ঞতা নেওয়া যায়। এখানে প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনের সুযোগ অন্য যেকোন সেক্টরের চেয়ে বেশি। আন্তর্জাতিক এনজিও গুলোতে ম্যানেজারদের বিভিন্ন পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বিদেশে যেতে হয়। এছাড়া তারা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রজেক্টের জন্য দক্ষ কর্মী আদান প্রদান করে থাকেন।

এনজিওতে নারীদের জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা রয়েছে। এই সেক্টরটিকে বলা হয়ে থাকে 'Women Friendly'। এখানে নারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। কোন কোন এনজিতে যাতায়াত ভাড়া পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের বেশি দেওয়া হয়। এছাড়া তাদের নিরাপত্তার দিকেও যথেষ্ট খেয়াল রাখা হয়। এনজিওতে মৌলিক বেতনের পাশাপাশি বাড়ি ভাড়া, যাতায়াত ভাতা, উৎসব ভাতা, মাতৃত্বকালীন/পিতৃত্বকালীন ছুটি ইত্যাদি দেওয়া হয়। এছাড়া Hardship Allowance ও প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো যেহেতু বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাজ করে, সেহেতু তারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরাপত্তার বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখে।

**এনজিও পেশার চ্যালেঞ্জ সমূহঃ** এনজিওতে কাজ খুবই প্রাণবন্ত এবং বহুমাত্রিক, তবে পেশার ঝুঁকি চ্যালেঞ্জসমূহও বহুবিধ যা আপনাকে যেকোন প্রতিষ্ঠানে চাকরি নেওয়ার পূর্বে এই সেক্টরে প্রতিষ্ঠানটির অবস্থান সম্পর্কে সঠিক তথ্য নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেসব বিষয়ে খোঁজ নিতে হবে সেগুলো হলঃ

- এনজিওটির সামাজিক পরিচিতি কতটুকু তা পরিলক্ষণ করুন।
- এই সেক্টরের কারও সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে এনজিওটি সম্পর্কে জানুন।
- এনজিওটি রেজিস্টার্ড কি-না তা যাচাই করুন।
- ওয়েবসাইট যাচাই করুন।
- এনজিওটি কোন কোন বিষয়ের উপর কাজ করে তা জেনে নিন।
- কোন দুর্গম এলাকায় কাজ করে কিনা জেনে নিন।
- প্রজেক্ট ভিত্তিক কাজ হলে প্রজেক্ট হঠাৎ শেষ হলে আপনার চাকরি থাকবে কিনা জেনে নিন।
- ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি থাকলে কর্মসূচির সার্বিক অবস্থান কোন পরিস্থিতিতে এবং আপনি কোন পজিশনে যোগদান করছেন, তার কাজ কি কি এবং কোথায় কাজ করতে হবে ইত্যাদি ভালো ভাবে জেনে নিন।
- কাজে ফাঁকি দিয়ে এ পেশায় ভাল করার সুযোগ নেই।
- নির্ধারিত অফিস সময়ের পর আপনি বাড়ি যেতে পারবেন কিনা তা নির্ভর করবে আপনার কাজ শেষ হয়েছে কিনা তার উপর।
- অফিসের প্রয়োজনে আপনাকে বিভিন্ন উৎসবের ছুটি ভোগ করার সুযোগ নাও হতে পারে।

এখানে চাকরি দেওয়ার আগে আপনার মানসিক অবস্থা বুঝতে ভাইভা বোর্ড পরীক্ষা করতে পারে। অবশ্য এও সত্যি, এই পেশায় আসতে হলে আপনাকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাওয়ার কথা ভাবতে হবে। পদ ও চাহিদানুযায়ী আপনি মাঠপর্যায়ে জব করবেন নাকি অফিসিয়াল ওয়ার্ক করবেন, সেটা নিশ্চিত হওয়া যাবে। সুতরাং কাজের ক্ষেত্র অনুযায়ী সুদূরপ্রসারী চিন্তা অবশ্যই করতে হবে। যেমন প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে আপনার কাজের ক্ষেত্র হতে পারে তেমনি দেশের বাইরে বিদেশেও আপনার জব স্টেশন হতে পারে। আর এই ক্ষেত্রে সুখবর হল, বিদেশে এনজিওতে জব হলে অবশ্যই আপনাকে বিদেশে পাঠানো হবে এবং আপনার স্যালারি হবে আন্তর্জাতিক মানের অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল পলিসি অনুযায়ী বেতন-কাঠামো আপনার জন্য নির্ধারিত হবে।

**এ পেশার আত্মতৃপ্তিঃ** এনজিও চাকরির বড় সুযোগ এবং সুবিধা হল কাজের ফাঁকে, এমনকি জব করার ফাঁকেও আপনি আর্তসেবা, মানবসেবা, প্রকৃতিসেবাসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তাই যাদের নেশা মানবসেবা, আর্তসেবা, তারা নির্দ্বিধায় এই আকর্ষণীয় পেশাতে আসতে পারেন শুধু

মানুষের সঙ্গে মেশার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। তাই প্রতিনিয়ত নিত্য-নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করুন। আর এ যোগ্যতাই আপনাকে নিয়ে যাবে আত্মতৃপ্তির এক মহান জগতে। কারণ সভ্যতা এগিয়ে আসার পিছনে মূল শক্তি হল দরিদ্র মানুষের পবিত্র পরিশ্রমের হাত। এই সত্যকে ধারণ করেই এনজিও পেশায় এগিয়ে যেতে হবে। এনজিও পেশা অনেক পরিশ্রমের। এ পেশাকে যারা ভালোবাসতে পারবেন না, তাদের এখানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হলেও পেশাদারিত্ব গড়ে উঠবে না। তাই এ কাজ আপনার ভাল লাগবে কিনা তা নির্ভর করবে আপনার পেশাদারিত্বের উপর। কাজের প্রতি ভালোবাসা ছাড়া পেশাদারিত্ব গড়ে ওঠে না। তাই এনজিও কাজের প্রতি ভালবাসার মনোভাব নিয়ে কর্মে যোগদান করুন, দেখবেন আপনার কর্মসংস্থানও হবে, আপনার জীবনের অনিশ্চয়তাও দূর হবে। হ্যাঁ, এখানে মিরাক্যাল কোন ঘটনা নেই, যা আপনাকে রাতারাতি ক্যাসিনো মালিকের মত অঢেল সম্পত্তির মালিক করে দেবে, তবে আপনি সৃজনশীল মানুষ হলে, কাজকে ভালবাসলে, কঠোর পরিশ্রমী হলে সততার সাথে ভালো থাকবেন। আর মানুষ হিসাবে আমরা জীবনের শেষ প্রান্তে যখন আসি, তখন সারাজীবনের ভালমন্দ কাজের প্রতিচ্ছবি আমাদের অন্তর্দৃষ্টিতে বা হৃদয়পটে ভেসে ওঠে, তখন আমরা মন্দ কাজের জন্য অনুশোচনা করি, অনুতপ্ত হই। হাতে সময় না থাকায় নিজেকে সংশোধন করার সুযোগ থাকেনা, থাকেনা শারীরিক সক্ষমতা। কিন্তু আপনি এনজিওতে চাকরি করার পাশাপাশি সারাজীবন ভাল কাজ করার সুযোগ পাবেন। এজন্য বৃদ্ধ কাল টা আপনার আত্মতৃপ্তিতে ভরপুর থাকবে, থাকবে স্বস্তি ভরা মন। তাই আপনি হবেন আত্মতৃপ্তির অপার মহিমায় অনন্ত পরজগতের পরিভ্রমণকারী।

**এ সময়ের এনজিও পেশা:** একটা সময় এনজিও ক্যারিয়ারকে নিচু শ্রেণীর পেশা হিসেবে ভাবা হত। চাকরির নিশ্চয়তা কিংবা সামাজিক মূল্য ছিলনা। কিন্তু সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানুষের গায়ে পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে। তাই মানুষ শুধু শুনেই সব মেনে নিতে চায়না এখন। সচেতন মানুষ যখন চোখ মেলে তাকালেন, বুঝতে পারলেন এনজিও যথেষ্ট সম্মানজনক পেশা যেখানে চাকরির পাশাপাশি রয়েছে সেবামূলক কাজের সুযোগ। কিংবা যেখানে চাকরিটাই একটা সেবা। তাছাড়া এনজিও আসলেই একটা চ্যালেঞ্জিং পেশা। বেতনও ভালো তাই চাকরি প্রত্যাশীরা সফল ক্যারিয়ার গড়তে ঝুঁকতে শুরু করলেন এনজিওতে।

**উপসংহার:** আমি জানি যে, এই পেশায় অনেক চ্যালেঞ্জ আছে। আছে চাকুরির নিশ্চয়তার ঝুঁকি, নানা ধরণের বাঁধা বিপত্তি। কিন্তু সেগুলো হাসি মুখে গ্রহণ করতে হবে এই কারণে যে, মনে করতে হবে আমি এদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। এই দরিদ্র মানুষের কঠোর শ্রম কিভাবে এদেশের উন্নয়নের সোপান রচিত করে তা দেখার অপার সুযোগ এ পেশায় আছে। এ পেশা ছাড়া অন্য কোন পেশায় এমন সুযোগ আছে বলে আমার মনে হয় না। তাই এ পেশা গ্রহণের মাধ্যমে জীবনকে ভালভাবে জানবার, বুঝবার, উপলব্ধি করবার সুযোগ পাবেন। এ পেশা মানুষের কঠোর কর্ম ও কর্মসংস্থানের নিগূঢ় সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত।'

(এ নিবন্ধটি ইতিপূর্বে "আইডিএফ পরিক্রমা", জুলাই - ডিসেম্বর ২০২২ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। লেখকের অনুমতি নিয়ে এখানে পুনর্মুদ্রিত হলো।)

*লেখক: পরিচালক, ক্ষুদ্রঋণ, আইডিএফ*

# আবীর রাঙা সন্ধ্যা

## হুমায়ুন কবির

আবীর রাঙা শেষ বিকেলে, বকের পাখার ছায়ায়
সন্ধ্যা নামে চাঁদের সঙ্গে নিশির আজব মায়ায়!
উড়ে আসে পাখি নীড়ে
সন্ধ্যা যখন নামে ধীরে।
চাঁদের আলো হাসে তখন ডুমুর বনে এসে
ঝিঁঝিঁ পোকা বেড়ায় বনে আলোর না'য়ে ভেসে।

রাতের আঁধার চাঁদের আলো, ঝিঁঝিঁ পোকার মেলা
আমার মনে লাগে তখন খুশির মহা মেলা।
আকাশ ভরা তারার আলো
ভেদ করে দেয় রাতের কালো
দিনের ক্লান্তি শেষে শান্তি রাতের বাতাস মেখে
সন্ধ্যা আকাশ রঙের মেলা প্রশান্তি যায় ডেকে।

হিজল বনের কুসুম সন্ধ্যা, দোয়েল পাখির ডানায়,
কালী সন্ধ্যা দিন কে এসে হেসে বিদায় জানায়।
আমি তখন একলা মনে
খেলা করি ঝিঁঝিঁর সনে
ফসল খেলে চাঁদের আলোয় মাঠের বুকে বুকে,
আঁধার জয়ের স্বপ্ন নিয়ে হাঁটি আমি সুখে।

## নতুন ৪টি স্কুলে
# মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার উদ্বোধন

১০ অক্টোবর ২০২৩এ সিদীপের চট্টগ্রাম এরিয়ায় বড় কুমিরা শাখার আওতায় স্থানীয় লতিফা সিদ্দিকী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার উদ্বোধন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মো: লোকমান মিয়া এবং অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও চট্টগ্রাম এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার হাফেজ মো. তারেকুল ইসলাম, বড় কুমিরা শাখার ম্যানেজার মো. মাহবুবুর রহমান, উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার হামিদুল ইসলাম, শিক্ষা সুপারভাইজার সুমাইয়া সিমু এবং প্রধান কার্যালয় থেকে গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা মো. মাহবুব উল আলম উপস্থিত ছিলেন।

১১ অক্টোবর সিদীপের চট্টগ্রাম এরিয়ায় সীতাকুন্ড শাখার আওতায় স্থানীয় সীতাকুন্ড সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার উদ্বোধন করা হয়েছে। পাঠাগার উদ্বোধন করেন বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক বাবুল চন্দ্র দে। এসময় অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও চট্টগ্রাম এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার হাফেজ মো. তারেকুল ইসলাম, সীতাকুন্ড শাখার ম্যানেজার মো. আব্দুর রশিদ মিয়া, উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার মনিরুল ইসলাম তামিম, শিক্ষা সুপারভাইজার মোছা. তানজিনা আক্তার এবং প্রধান কার্যালয় থেকে গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা মো. মাহবুব উল আলম উপস্থিত ছিলেন।

১২ অক্টোবর সিদীপের চট্টগ্রাম এরিয়ায় মীরসরাই শাখার আওতায় স্থানীয় আবুতোরাব বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মর্জিনা আকতার অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতে বিদ্যালয়ে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার উদ্বোধন করেন। এসময় মীরসরাই শাখার ম্যানেজার মো. আরিফুজ্জামান, শিক্ষা সুপারভাইজার রোকেয়া বেগম এবং কয়েকজন শিসক শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও সিদীপের গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা মো. মাহবুব উল আলম উপস্থিত ছিলেন।

১৫ অক্টোবর সিদীপের আশুলিয়া শাখার আওতায় দোসাইদ অধন্য কুমার উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে মুক্তপাঠাগার নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার জনাব মনোয়ারা বেগম, সহকারী প্রধান শিক্ষক মো. জহির উদ্দিন, গ্রন্থাগারিক আব্দুল জব্বার, অন্যান্য শিক্ষক এবং সিদীপের আশুলিয়া শাখার বিএম মো. উজ্জ্বল শিক্ষাসুপারভাইজার সাদিয়া আক্তার এবং প্রধান কার্যালয় থেকে গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা আলমগীর খান উপস্থিত ছিলেন।

# মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারে

## বই-পর্যালোচনা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ

৮ নভেম্বর ২০২৩এ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলায় চারগাছ এন আই ভূঁইয়া উচ্চবিদ্যালয়ে সম্মানিত প্রধান শিক্ষক মো. মজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের উদ্যোগে বই পর্যালোচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণি অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন ধর্মীয় শিক্ষক জামাল উল্লাহ, সিদীপের প্রধান কার্যালয়ের গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা জনাব আলমগীর খান, ডিএম খন্দকার শফিকুল ইসলাম, বিএম মিজানুর রহমান, বিএম রমজান আলী খান, সমৃদ্ধি কর্মসূচির কো-অর্ডিনেটর দীপক রঞ্জন দেবনাথ, শিক্ষাসুপারভাইজার নাজমা আক্তার ও অন্যরা। পুরস্কার গ্রহণ করে নুসরাত জাহান, মার্জিয়া ও তাইয়্যেবা।

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারে'র উদ্যোগে ১৩ নভেম্বর বিকালে পাবনার দেবোত্তর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে বই পর্যালোচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ ও বই পড়া নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান শিক্ষিকা জনাব মাহাবুবা মায়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন স্কুলে পাঠাগারের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষিকা আফরোজা খাতুন, অন্যান্য শিক্ষক ও অভিভাবকগণ। শিক্ষার্থীরা গান ও আবৃত্তি পরিবেশন করে। বেগম রোকেয়ার সুলতানার স্বপ্ন, জাফর ইকবালের ইস্টিশন ও আশরাফ আহমেদের একাত্তরের হজমিওয়ালা ইত্যাদি বইয়ের উপর লেখা সেরা রচনার জন্য পুরস্কার গ্রহণ করে মাইশা, আলপনা ও মোহনা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন সিদীপের দেবোত্তর শাখার শিক্ষাসুপারভাইজার কাকলি খাতুন। সিদীপ প্রধান কার্যালয় থেকে উপস্থিত ছিলেন গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা আলমগীর খান।

একই দিনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নয়নপুর শাখার আওতায় রাবেয়া মান্নান ভূঁইয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের বই পর্যালোচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এসময় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব জসিম উদ্দিন, দুইজন সহকারী শিক্ষক, শিক্ষার্থীগণ ও সিদীপের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার আল ইমরান হোসেন ও শিক্ষা সুপারভাইজার নাসরিন আক্তার উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একজন শিক্ষানুরাগী ব্যাক্তিত্ব ব্যারিস্টার মোরশেদুর রহমান উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের বই পড়ার প্রতি উৎসাহিত করে বক্তব্য প্রদান করেন এবং সিদীপের এই আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

# আঁচল ছাড়ার দৃশ্যটা যে

### মাহ্‌ফুজ সালাম

মেঘের লুকোচুরি
চোখের পাপড়িতে লুকোনো আলো
তারায় তারায় জ্বলে ।

শরৎ নাচে কাশফুলের শুভ্রতায়
ঘরের বেড়ায় জড়ানো শাড়ি
বেদনার নীল উড়ে যৌবনবতী বাতাসে।

সুখের দোলায় দোলে রোদের নাচন
ভালবাসার রূপ বদলায় ধূসরতায়
শিউলির সাদা প্রাণ উড়ে হাতের বাতাসে।
সহজ আনন্দের পিছে দৌড়ানোর
কষ্টগুলো নিয়ে খেলা করে উর্বশী চাঁদ,
সূর্যলোক নিয়ে যায় শালুক খোঁজার
শাপলা হাসির দিনগুলোতে।

কচুর পাতার বিষন্নতায় শিশির কণা
ঝরে পড়ে টাপুর টুপুর
বৃষ্টিভেজা পথের কাদায়
মাটির লাঙ্গল
গাঁওগেরামের কেঁচোর কথা মনে ভাসে
কার্তিক এলেই ।
বুকের মাঝে বাজনা বাজে
ঢোলের বোলে কাঁসার থালে
চিকন সুরের উলুধ্বনি।

হাজার লোকের ভিড়ের মাঝে
কষ্টগুলো বিলাই শুধু
একলা ফেলে চলে যাবার
আঁচল ছাড়ার দৃশ্যটা যে।

# পিকেএসএফের এএমডি কর্তৃক
## সিদীপ প্রকল্প পরিদর্শন

১২ অক্টোবর ২০২৩এ আশুলিয়া শাখায় পিকেএসএফ-এর PACE প্রকল্পের আওতায় সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেসের (সিদীপ) ভ্যালু চেইন প্রকল্প এবং মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার পরিদর্শন করেন পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো. ফজলুল কাদের। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন পিকেএসএফ-এর সহকারি মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও পেইস প্রকল্পের সমন্বয়কারী জনাব মো. হাবিবুর রহমান এবং পিকেএসএফ-এর ভ্যালু চেইন প্রকল্প সুপারভাইজার এবং ডেপুটি টিম লিডার জনাব এস. এম. ফারুক-উল-আলম, পিএইচডি। অতিথিগণ আশুলিয়া এসে পৌঁছালে সিদীপের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা তাদেরকে নিজহাতে আঁকা ছবি উপহার দিয়ে বরণ করে নেয় এবং ফুলের তোড়া দিয়ে তাদের স্বাগত জানানো হয়। এ সময় সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা এবং শীর্ষ কর্মকর্তাগণ অতিথিদের অভ্যর্থনা জানান।

সিদীপের ভ্যালু চেইন প্রকল্প মূলত কাঁঠাল ও অন্যান্য ফল শুষ্ককরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প। সবশেষে জনাব মো. ফজলুল কাদের দোসাইদ অধন্য কুমার স্কুল এন্ড কলেজে স্থাপিত মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার পরিদর্শন করেন। তিনি এই পাঠাগার প্রয়াসের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং কিছু সুচিন্তিত পরামর্শ দেন।

# মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারে
## সেরা পাঠক-পাঠিকার পুরস্কার বিতরণ

৮ নভেম্বর ২০২৩এ সিদীপের বারইয়ারহাট শাখার আওতায় চিনকি আস্তানা উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক জনাব মোকাররম হোসেন চৌধুরী ও সিদীপের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার নিমাই চন্দ্র সরকার, সিদীপের শিক্ষাসুপারভাইজার নাজমা আক্তার এবং গবেষনা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা মো. মাহবুব উল আলমের উপস্থিতিতে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারে সেরা পাঠক-পাঠিকার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। শিক্ষার্থীদের বই পড়ায় আগ্রহী করে তুলতে মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগারের পাঠকদের জন্য সিদীপ এই আয়োজনটি করে। সেরা পাঠক-পাঠিকা প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়য়ের দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী সাকিফা সুলতানা প্রথম স্থান, অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থী আঞ্জুমান আরা চৌধুরী দ্বিতীয় স্থান এবং নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী উর্মি আক্তার তৃতীয় স্থান অর্জন করে। অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার হিসেবে বই তুলে দেয়া হয় এবং সিদীপের পক্ষ থেকে মুক্তপাঠাগারের জন্য নতুন ১০টি বই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের হাতে হস্তান্তর করা হয়।

# বীমা ও আর্থিক খাতে রূপান্তরমূলক পরিবর্তন আনার উদ্দেশ্যে
# সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র কৃষকদের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে জলবায়ু ঝুঁকি সুরক্ষা অর্থায়ন কর্মসূচির আওতায় ১৭ সেপ্টেম্বরে বীমা খাতে রূপান্তরমূলক পরিবর্তন আনার উদ্দেশ্যে দেশের শীর্ষস্থানীয় সাতটি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কে. এম. দত্তর অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেডের এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। রাজধানীর গুলশান ২-এর হোটেল সিক্স সিজনে অনুষ্ঠিত এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের (পদক্ষেপ) নির্বাহী পরিচালক জনাব মো. সালেহ বিন শামস, সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেসের (সিদীপ) নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা, দিশা স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মো. রবিউল ইসলাম, সোসাইটি ফর সোশ্যাল সার্ভিসেসের (এসএসএস) পরিচালক ও মানবসম্পদ ও অ্যাডমিন প্রধান জনাব মাহবুবুল হক ভূঁইয়া, পিপল ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশনের (পপি) নির্বাহী পরিচালক জনাব মুর্শেদ আলম সরকার, কোস্ট ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক জনাব এম. রেজাউল করিম চৌধুরী এবং অ্যাসোসিয়েশন ফর পিপলস ডেভেলপমেন্ট স্ট্রিম-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম খান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন কে. এম. দত্তর অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড এবং সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরকারী সাতটি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তাগণ।

# জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাই বিষয়ক
# চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির উদ্যোগে মাইক্রোফাইন্যান্স ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (MF-CIB) তে জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাই বিষয়ক শীর্ষ ৫০টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান এমআরএ কনফারেন্স রুমে ১৮ অক্টোবর ২০২৩এ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এমআরএ-র এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মো. ফসিউল্লাহ্। এমআরএ-র পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন নির্বাহী পরিচালক জনাব মুহাম্মদ মাজেদুল হক এবং শীর্ষ ৫০টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালকগণ। এছাড়া উক্ত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অথরিটির পরিচালক, উপ-পরিচালক এবং শীর্ষ ৫০টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের এমএফ-সিআইবি-এর ফোকাল পার্সনগণ ।

এভাবে ১৮৩৫ সালে এদেশের মানুষের জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে একটি আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা (প্রচলিত সামন্তবাদী শিক্ষার পরিবর্তে) প্রচলনের সুযোগ নষ্ট হয়ে গেল । এর ফল যে শুভ হয় নি, আজ তা কেউই অস্বীকার করতে পারে না। মেকলের প্রস্তাবটি কার্যকর করার পর এদেশে প্রাথমিক সর্বজনীন শিক্ষার আঙিনা থেকে দেশের বৃহত্তর গতরখাটা মানুষ ছিটকে পড়ল, তাদের আর সেখানে ফিরিয়ে আনা গেল না। মেকলের ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা প্রমাণ করে 'নিম্ন পরিস্রাবণ নীতির' মাধ্যমে শিক্ষাকে বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেয়া গেল না বিগত ১৭৫ বছরেও। অথচ সেদিন যে স্বল্পসংখ্যক ধনী ও অভিজাত মধ্যশ্রেণীকে শিক্ষিত করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, তখন মেকলে ও তাঁর সমর্থকরা জোর গলায় বলেছিল তাদের মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা সর্বস্তরের মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়বে। সেই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে পাদ্রী উইলিয়াম এডামের রিপোর্টে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ভিন্নমত তুলে ধরা হয়েছিল।

বেন্টিংক কেন এডামের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা না করে মেকলের প্রস্তাবটি অনুমোদন করেন, এই প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে অনেকেই গবেষণা করেছেন। জানা যায় ইংল্যান্ডে অবস্থিত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ 'কোর্ট অব ডাইরেক্টরস' এবং ভারতবর্ষের 'জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন' এদেশে শিক্ষা নিয়ে একই রকম মনোভাব পোষণ করতো। তারা একই নীতিতে বিশ্বাস করতো। তাহলো, "The Emphasis of Government policy should be on higher education of the upper classes and not on elementary education of masses which was of subordinate importance." (Basak 2: 252)। উচ্চকোটির উচ্চশিক্ষাই তাদের কাম্য, নিম্নকোটি মানুষের প্রাথমিক শিক্ষা তাদের কাছে গুরুত্বের দিক থেকে হীনতর। ১৮২৩ সালে জেনারেল কমিটি গঠিত হবার পর ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে অল্পসংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। বলা হয় যে, আর্থিক সংকটের কারণে সেসব স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা যায় নি। ১৮১৩ সালের সনদে শিক্ষার জন্য যে এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, ১৮৩৫ সালের আগে পর্যন্ত তার প্রায় সবটাই সংস্কৃত-আরবী-ফার্সী ভাষার স্কুল প্রতিষ্ঠা ও সেগুলো পরিচালনার জন্য ব্যয় করা হয়। কিন্তু ১৮৩৫ সালের মেকলের প্রস্তাবটি গৃহীত হবার পর পুরো টাকাটা ইংরেজী ভাষার প্রতিষ্ঠানের পিছনে খরচ করা হয়। স্মরণযোগ্য যে ১৮৩৩ সালের সনদে শিক্ষাখাতের জন্য আরো দশ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। ইংরেজী ভাষার অর্থকরী মূল্য বৃদ্ধির কাজে পুরো টাকাটাই সুপরিকল্পিতভাবে খরচ করা হয়। ১৮২৭ সালে জেনারেল কমিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পিছনে আর কোনো অর্থ খরচ করবে না– এমন সিদ্ধান্ত নিলে লন্ডনের 'কোর্ট অব ডাইরেক্টরস' ১৮২৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর তা সমর্থন করে একটি চিঠি পাঠায়। সে চিঠিতে বলা হয়, "The Directors approved the committee's action in refusing aid to the Vernacular schools" (Basak 2 : 251) ১৮৩০ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর পাঠানো ডেসপাচে কোর্ট অব ডাইরেক্টরস পরিষ্কার ভাষায় জেনারেল কমিটিকে জানিয়ে দেয় যে প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ে তাদের কোন আগ্রহ নেই। "With respect to elementary schools which were established by government in various parts of India previously to the appointment of the General Committee, we consider them of subordinate importance" (Basak 2: 252)।

'নিম্ন পরিস্রাবণ' নীতির বড় সমর্থক ট্রেভেলিয়ান ও ডাফ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন পিরামিডের চূড়ায় পশ্চিমা জ্ঞান ছেড়ে দিলে একদিন তা চুঁইয়ে নীচে নেমে আসবে। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, 'নিম্ন পরিস্রাবণ নীতির প্রয়োগ সমাজের উঁচু ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকেই শুরু করা উচিত এবং তাঁরা শিক্ষিত হলে তাঁদের মাধ্যমে আধুনিক পশ্চিমা জ্ঞান ক্রমান্বয়ে নিম্নকোটির মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়বে। ইউরোপের জ্ঞান জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছে দেবার প্রথম ধাপ ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে জ্ঞানচর্চা করা। কারণ ইংরেজী পৃথিবীর 'শ্রেষ্ঠ' ভাষা। এই শ্রেষ্ঠ ভাষা সম্পর্কে পেনিকুকের মন্তব্য হলো, "The present distribution throughout the world of the major international languages - Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish -is evidence of conquest and occupation, followed by adoption of the invader's language because of the benefits that accrue to speakers of the language when the dominant language has been imposed." (Pennycook 34:31)। ভাষার সঙ্গে ক্ষমতা ও আধিপত্যবাদের সম্পর্কটি এখানে স্পষ্ট। অতএব, এডাম মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে সমগ্র জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে তোলার যে প্রস্তাব করেছেন তা নিতান্তই অবাস্তব। কারণ বাংলা ভাষা তখনও খুব দুর্বল। লন্ডনের কোর্ট অব ডাইরেক্টরস ১৮৩০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর মাদ্রাজ সরকারকে লেখে, "The improvements in education, however, which most effectually contribute to elevate the moral and intellectual condition of a people, are those which concern the education of the higher classes; you would eventually produce a much greater and more beneficial change in the ideas and feelings of the community than you can hope to produce by acting directly on the more numerous class". (Basak 2: 290) সরাসরি আমজনতার মাঝে শিক্ষা বিস্তারের চাইতে উচ্চকোটি মানুষের মাঝে ইউরোপীয় জ্ঞান প্রচার করা যেমন সহজ তেমনি সফল হবার সম্ভাবনা অনেক বেশী। জেনারেল কমিটির প্রেসিডেন্ট মেকলে ১৮৩৭ সালের ৩১ জুলাই স্পষ্ট ভাষায় একই কথার প্রতিধ্বনি করেন। "We do not at present aim at giving education directly to the people of lower classes of the country". (Basak 2: 290)। এত বড় কাজ হাতে নেবার মত অর্থ নাকি ইংরেজ সরকারের ছিল না। তিনি আরো বলেন, "We aim at raising an educated class who will hereafter, as we hope, be the means of diffusing among their countrymen some portion of the knowledge we have imparted to them." (Basak 2: 290) জেনারেল কমিটির আর একজন প্রভাবশালী সদস্য চার্লস ই ট্রাভেলিয়ানও একই কথা বলেন। "Our main object is to raise up a class of persons who will

make the learning of Europe intelligible to the people of Asia in their own languages." (Basak 2:271)। তবে তাঁর এ বক্তব্যে একটি সত্য কিন্তু প্রকাশ পেয়েছে। তা হলো সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে মাতৃভাষার বিকল্প নেই।

১৮৩৮ সালে সি.ই ট্রাভেলিয়ান তাঁর বইতে জানান, "আমরা মাতৃভাষায় শিক্ষার গুরুত্ব একেবারেই অস্বীকার করি না এবং তাকে যে সর্বতোভাবে উৎসাহ দেওয়া উচিত সে সম্বন্ধেও আমরা যথেষ্ট সচেতন। ৭ মার্চ, ১৮৩৫ এর প্রস্তাব গ্রহণের সময় এই কথা মনে রেখেই আমরা ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে সিদ্ধান্তগ্রহণ করেছি। আমরা বিচার করে দেখেছি যে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান সংস্কৃত ও আরবী মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে ইংরেজীতে শিক্ষা দেওয়া অনেক ভাল। যদি ইংরেজীর বদলে সংস্কৃত ও আরবীতে শিক্ষা দেওয়া হতো, তা হলেও অবশ্য মাতৃভাষার শিক্ষা দেওয়ার প্রশ্ন থেকেই যেত। সংস্কৃত ও আরবী তো আর মাতৃভাষা নয়। সুতরাং আমরা পাশ্চাত্য বিদ্যা-শিক্ষার আবশ্যকতা স্বীকার করে নিয়ে, কেবল এইটুকু সিদ্ধান্ত করেছি এই বিদ্যা আরবী ও সংস্কৃতের বদলে ইংরেজীতে শিক্ষা দেয়া অনেক বেশী সহজ ও সঙ্গত। ভবিষ্যত সমস্ত শিক্ষাই যাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে হয় সেদিকে আমাদেরও লক্ষ্য ছিল। মাতৃভাষার গুরুত্বকে আমরা কখনও অস্বীকার করিনি, করার কোন যুক্তিসংগত কারণও নেই" (ঘোষ ১৭ : ১৯৭)। ১৮৩৮ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত ট্রেভেলিয়ানের On the Education of the people of India গ্রন্থের ২০-২৪ পৃষ্ঠা থেকে অংশটুকু অনুবাদ করেছেন বিনয় ঘোষ। ট্রাভেলিয়ান ইচ্ছা ও অনিচ্ছাসত্ত্বে অস্বীকার করেন নি যে ইংরেজীও এদেশের মানুষের মাতৃভাষা নয়। কিন্তু বিস্ময়ের হলেও সত্যি, বাংলা ভাষার জন্য যে বাঙালী জাতি বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে রাজপথ লাল রঙে রাঙিয়েছিল, সে জাতির উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শাসকশ্রেণী আজও মাতৃভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারল না।ট্রাভেলিয়ানের এই বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে যে এডামের মাতৃভাষার দাবীকে অস্বীকার ও নিন্দা করে ইংরেজী ভাষার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কোর্ট অব ডাইরেক্টর্সের প্রভাবশালী সদস্য সি. ই ট্রাভেলিয়ানের মাতৃভাষার গুরুত্বের সম্পর্কে এই মায়াকান্না সবই ছিল পূর্বপরিকল্পিত সাম্রাজ্যবাদী সিদ্ধান্ত।

নীহাররঞ্জন রায়ের উদ্ধৃতিতে আমরা লক্ষ্য করেছি যে বাংলার তথাকথিত রেনেসাঁর নায়ক রামমোহন থেকে বঙ্কিম পর্যন্ত সবাই ইংরেজের ওই 'নিম্ন পরিস্রাবণ' নীতি সমর্থন করেন। এতে ইংরেজদের কাজটি সহজ হয়ে যায়। নীহার রায়ের সমর্থনে একটি ছোট্ট উদাহরণ। জেনারেল কমিটির একজন প্রভাবশালী ভারতীয় সদস্য প্রসন্নকুমার ঠাকুর বলেন, "Could we find a few native youths qualified in the English arts and sciences and possessed of sufficient knowledge to express their acquired ideas through the Vernacular languages, they might, we think, be trained in the combined duties of authors and teachers. This was at least the first and surest step eventually to establish a permanent system of Indian national education." (G.C.P.I, Bengal-progs. at 1939- 1840, App.1. Basak 2: 271) বাঙালী প্রসন্নকুমার ঠাকুরও মেকলে ট্রেভেলিয়ানের সুরে সুর মিলিয়েছেন। একটু পিছনে তাকানো যাক। ১৮৭২ সালে প্রকাশিত A Howell তাঁর Education of British India বইতে লিখেছিলেন, "Education in India under British Government was first ignored, then violently and successfully opposed, then conducted on a system now universally admitted to be erroneous and finally placed on its present footing". (Adam 1: Introduction- XV)। অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকার ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রথমে ছিল উদাসীন; তারপর ভয়ঙ্করভাবে ও সাফল্যের সঙ্গে তার বিরোধিতা করে; তারপর এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলে (নিম্ন পরিস্রাবণ নীতির ভিত্তিতে) ব্যতিক্রমহীনভাবে সবাই আজ যাকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করে এবং শেষে বর্তমান অবস্থায় দাঁড় করায়। হওয়েল যখন বইটি লেখেন (১৮৭২) তখন এদেশের উডের ডেসপাচ বাস্তবায়নের যুগ। এতে প্রমাণ হয় যে এদেশের শিক্ষার প্রতি ব্রিটিশ শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গি বরাবর একরকম ছিল না। তবে এটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা নয়। গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো এই যে শিক্ষা স্বয়ম্ভু কোনো বিষয়ে নয়। সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষানীতিরও পরিবর্তন হয় (ইসলাম ১০ : ৪২)। শাসক শ্রেণী তাদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে।

আমরা জানি শাসনের প্রাথমিক স্তরে ইংরেজ শাসকবৃন্দ যে শিক্ষানীতি অনুসরণ করে তাকে সবাই 'প্রাচ্যনীতি' বলে মনে করেন। এই পর্বে ১৭৮১ সালে ওয়ারেন হেস্টিংসের কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপনের মাধ্যমে ওই নীতির বাস্তবায়ন শুরু হয়। দশ বছর পর ১৭৯১ সালে বেনারসের রেসিডেন্ট জোনাথান ডানকান সেখানে একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন আরবী, ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষা ও তার সাহিত্য সম্পর্কে ভালবাসার বশবর্তী হয়ে নয়, বরং প্রয়োজনে। ১৭৭২ সালে কলকাতা হাইকোর্ট এবং ১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল স্থাপিত হলে আরবী, ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষা জানা মানুষের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হয়। কিন্তু এদেশের সাধারণ মানুষ যে ভাষায় পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত সেই বাংলা ভাষার প্রতি কোম্পানীর কোন মনোযোগ ছিল না। মনোযোগ ছিল বরং মিশনারীদের। কারণ খ্রিস্টধর্ম প্রচার করা চাই। মাতৃভাষা ছাড়া সেটা সম্ভব নয়। তাই প্রথম যুগে লন্ডনের কোর্ট অব ডাইরেক্টর্সের বিরোধিতা সত্ত্বেও মিশনারিরাই সর্বপ্রথম এদেশের দরিদ্র ও অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের মাঝে মাতৃভাষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। বাংলা গদ্য সৃষ্টিতে পাদ্রী উইলিয়াম কেরী ও তাঁর শ্রীরামপুর মিশনের সহযোগীদের অবদান অনস্বীকার্য। ১৭৯৩ সালে কেরী ভারতে আসেন এবং ৪১ বছর পর ১৮৩৪ সালে তিনি এদেশেই মারা যান।

বাংলা গদ্যের বিবর্তনের ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৮১৯ সালের রুবাক'স এ্যানালস্ (Roebucks Annals) এবং ১৮৪৭ সালের ক্যালকাটা রিভিউ-এর

vol-v No. 1x সংখ্যায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ইংরেজ শিক্ষার্থীদের পাঠ্যসূচী সম্পর্কে জানা যায় যে ভাষাগুলো শেখানোর ব্যবস্থা ছিল সেগুলো হলো আরবী, ফার্সী, সংস্কৃত। এছাড়া ছ'টি প্রদেশের মাতৃভাষা বাংলা, হিন্দুস্থানী (উর্দু ও হিন্দী), তামিল, তেলেগু, মারাঠি ও কানাড়া। অন্যান্য যেসব বিষয় শেখানো হতো সেগুলো হলো আইন, নীতিশাস্ত্র, ভারতীয় রেগুলেশন এবং গভর্নর জেনারেলের আইন, রাজনৈতিক অর্থনীতি, গ্রীক, লাতিন ও ইংরেজী ইতিহাস, ভারতের ইতিহাস, প্রাকৃতিক ইতিহাস, উদ্ভিদ বিজ্ঞান এবং রসায়ন। রাজভাষা ফার্সী ছিল বাধ্যতামূলক। তিন বছরের কোর্স শেষে শিক্ষার্থী যে প্রদেশে চাকরীতে যাবে, সেই প্রদেশের মানুষের মাতৃভাষাও ছিল তার জন্য অবশ্যপাঠ্য। ১৮৪১ সালে আইন পাল্টানো হয়। ফার্সীকে সরিয়ে ইংরেজী ভাষাকে বাধ্যতামূলক করা হলে বাংলা প্রদেশে চাকরীরতদের জন্য ফার্সীর বদলে বাংলা ভাষা অবশ্যপাঠ্য করা হয়। অন্যান্য ভাষার শিক্ষক মিললেও বাংলা জানা লোক কিন্তু কলকাতায় মেলে না। (প্রভাতকুমার মুখ্যোপাধ্যয় ১১ : ৪৭)। তাই ১৮০১ সালের মে মাসে কেরীকে বাংলা ভাষার শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। ওয়েলেসলি জানতেন যে শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিস্ট মিশনের পাদ্রীদের মধ্যে কেরী সাত বছর বাংলা চর্চা করেছেন। কেরী মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে প্রধান পণ্ডিত, রামনাথ বাচস্পতিকে দ্বিতীয় পণ্ডিত এবং রামরাম বসুকে একজন সহকারী পণ্ডিত হিসেবে নিয়োগ দান করেন। কিন্তু তখন বাংলায় পড়াবার মত বই কোথায়? কেরী লিখছেন, "When the appointment was made, I saw that I had a very important charge committed to me and no books or helps of any kind to assist me". (প্রভাতকুমার ১১:৪৯)। তখন তিনি নিজে বাংলা ব্যাকরণ লিখতে শুরু করলেন ও রামরাম বসুকে প্রতাপাদিত্যের জীবনী লিখতে প্রবৃত্ত করান। "The first prose book ever written in the Bengali language."। এর আগে নিউ টেস্টামেন্টের বাংলা তর্জমা শ্রীরামপুর প্রেস থেকে ছাপা হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। সজনীকান্ত দাসের কথায় "ইহাই শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশন কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম পুস্তক এবং উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জয়যাত্রার ইহাই প্রথম পদক্ষেপ।" (দাস ১২ : ১২৫)। এ প্রসঙ্গে ১৮৩৪ সালের ১০ ডিসেম্বর সমাচার দর্পণের সম্পাদকীয়ের কথা স্মরণ করা যায়। "The reason why the Bengali schools are in dying state for want of scholars is that a Knowledge of Bengali does not lead to the acquisition of wealth, but a knowledge of English is the surest path to it. The Natives of this country have no taste for knowledge. They seem to have settled it in their minds that an acquaintance with Bengali will rather prevent their acquiring wealth. .....Those acquainance with English may obtain situations as writers with long salaries and prospect of higher appointments. (Basak 2: 259)। এ অবস্থার কি আজও কোন পরিবর্তন হয়েছে?

সেই সময় হিন্দু কলেজের ছাত্ররা, ইতিহাসে যাঁরা 'ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী' নামে সুপরিচিত, তাঁরা উগ্রভাবে পাশ্চাত্যবাদী হয়ে উঠেছিলেন। যা কিছু ভারত-বাংলাদেশের সবই তাঁদের কাছে খারাপ। পশ্চিম থেকে আগত সবকিছুই ভাল। ফলে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের ইংরেজী ভাষাকে রাজভাষা করায় তাঁরা উল্লসিত। এর মধ্যে যে রাজনীতি আছে, অর্থনীতি আছে, তা তাদের নজর এড়িয়ে যায়। পুনর্জীবনবাদীদের বড় দুর্বলতা এখানেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বুঝেছিলেন ইংরেজের ইংরেজপ্রীতির মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী উপাদান লুকিয়ে ছিল। পাকিস্তান আমলে ভাষার সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান পোক্ত হয়। পাকিস্তানী শাসকরা আমাদের ওপর উর্দু চাপাতে পারেন নি। বাঙালীর পক্ষ থেকে প্রবল বাধা এসেছে। কিন্তু ইংরেজ আমলে সহজেই তারা ইংরেজী ভাষা চাপিয়ে দিতে পেরেছিল। বাংলা ভাষার অপরিণত অবস্থার ধূয়া তুলেছিল ইংরেজ শাসকবৃন্দ। সেকালের বাঙালী রেনেসাঁবাদীরা সাগ্রহে তা সমর্থন করেছিলেন। আমরা বুঝেছিলাম উর্দু ভাষার শোষণমূলক চরিত্র। কিন্তু রামমোহন রায় ও তাঁর অনুগামীরা তা বুঝতে পারেন নি।

জীবনের শেষ বছরে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে আক্ষেপ কেন? "য়ুরোপীয় জাতির স্বভাবগত সভ্যতার প্রতি বিশ্বাস ক্রমে কী করে হারানো গেল তারই এই শোচনীয় ইতিহাস আজ আমাকে জানাতে হল।" (ঠাকুর ১৬ : ৭৩৭)। রামমোহন থেকে বঙ্কিম পর্যন্ত সবার মত রবীন্দ্রনাথও এক সময়ে বিশ্বাস করতেন উন্নততর সভ্যতার অধিকারী ইংরেজ জাতির সান্নিধ্যে আমাদেরও আত্মার মুক্তি আসবে। লিখছেন, "তখন আমরা স্বজাতির স্বাধীনতার সাধনা আরম্ভ করেছিলাম কিন্তু অন্তরে ছিল ইংরেজ জাতির ঔদার্যের প্রতি বিশ্বাস। সে বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে একসময় আমাদের সাধকেরা স্থির করেছিলেন যে, এই বিজিত জাতির স্বাধীনতার পথ বিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে"।

সেই বিশ্বাস কীভাবে হারিয়ে গেল সুস্পষ্ট ভাষায় রবীন্দ্রনাথ সে কথাই জানিয়েছেন, 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে। মৃত্যুর বছরে তিনি প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের শক্তির দাপটই আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারেনি। তাই রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও "পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা অভিযানের প্রতি শ্রদ্ধা" রাখা অসাধ্য হয়েছে। তিনি বলছেন, "ভারতবর্ষ ইংরেজের সভ্যশাসনের জগদ্দল পাথর বুকে নিয়ে তলিয়ে পড়ে রইল নিরূপায় নিশ্চলতার মধ্যে"। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধদের সভ্যতাকে ক্রমাগত ব্যঙ্গ করে গেছে; দুর্বল বাংলা ভাষার অজুহাতে আমাদের মুখে ইংরেজী ভাষার জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দিয়েছিল, আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি নিয়ে হাসি ঠাট্টা ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। এই প্রবন্ধে জাপানের সঙ্গে তুলনা করে সে কথার এক জুতসই জবাব দিয়েছেন তিনি। "ভারতবাসী যে বুদ্ধি সামর্থ্যে কোনো অংশে জাপানের চেয়ে ন্যূন, একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই দুই প্রাচ্য দেশের সর্বপ্রধান প্রভেদ এই ইংরেজশাসকের দ্বারা সর্বতোভাবে অধিকৃত ও অভিভূত ভারত, আর জাপান এইরূপ কোনো পাশ্চাত্য

জাতির পক্ষছায়ার আবরণ থেকে মুক্ত।" (ঠাকুর ১৬ ৭৩৭)। শেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন, "সমস্ত য়ুরোপে বর্বরতা কি রকম নখদন্ত বিকাশ করে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত। এই মানবপীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে।"

১৮৩৫ সালে এডামের মুখে কিন্তু আমরা এমন কথাই শুনেছি। মেকলের শিক্ষানীতির বিরোধিতা করে এডাম বলেছিলেন। "The primary objection to this plan is that it overlooks entire systems of native educational institutions, Hindu and Muhammedan, which existed long before our rule, and which continue to exit under our rule, independent of us, and of our projects, forming and moulding up the native character in successive generations.

(Adam 1: 357) সেই সাথে বলেন, "We have to deal in this country principally with Hindus and Mohammedans, the former one of the earliest civilized nations of the earth, the latter in some of the brightest periods of their history distinguished promoters of science; and both, even in their present retrograde stages of civilization, still preserving a profound love and veneration for learning nourished by those very institutions of which I have spoken." (Adam 1: 357)। হিন্দু ও মুসলমান সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাবনত এডামের সে রিপোর্টটি মেকলে-বেন্টিংক গং হেলায় ফেলে দিয়েছিল। ইংরেজ জাতির সভ্যতার প্রতি রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধা হারিয়েছিলেন, কিন্তু আমাদের শিক্ষিত সমাজ আজও সেই শ্রদ্ধায় গদ গদ। এদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের বিরুদ্ধে বিলেতে তুমুল বিতর্ক উপস্থিত হয়। তার ঢেউ বাংলাদেশে এসেও লাগে। "১৮১৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সনদ নবায়নের অব্যবহিত পূর্ববর্তী সময়ে অবাধ বাণিজ্যে বিশ্বাসী ইংরেজরা কোম্পানীর বিশেষাধিকারের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ড এবং ভারতে তাদের আন্দোলন তীব্রতর করে তুলেছিলেন। অবাধ বাণিজ্যের সমর্থকদের অভিযোগসমূহ পার্লামেন্টের নিকট একটি দরখাস্ত মারফত পেশ করার জন্য জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে কলকাতার কতিপয় ব্রিটিশ ও ভারতীয় ব্যবসায়ী ও অন্যান্য নাগরিকের একটি তলবি সভা টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয়।" (আহমেদ ৬ : ১৭)। যেসব ভারতীয় সে দরখাস্তে স্বাক্ষর করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রামমোহন রায়। সালাহউদ্দীন আহমেদ বলছেন, "খুব সম্ভব উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভারতীয় ও য়ুরোপীয় প্রতিভূরা এই প্রথম এক মঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে সম্মিলিতভাবে তাদের দাবী উচ্চারণ করেছিল।" এদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ফেঁপে-ফুলে উঠছে। ১৬০০ সালে এর অংশীদার ছিল ২১৭ জন মাত্র। এদেশ দখলের অল্প সময়ের মধ্যে তা কয়েক হাজার ছাড়িয়ে যায়। ইংল্যান্ডে গড়ে ওঠা নতুন নতুন কলকারখানায় উৎপাদিত মালামাল বিক্রির বাজার চাই। তাই তাদের দরকার অবাধ বাণিজ্যের অধিকার। ১৮১৩ সালের সনদে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অবাধ বাণিজ্যের অধিকার কেড়ে নেয়া হয় এবং শিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। শিক্ষার প্রাচ্যনীতির ফলে তার প্রায় সবটাই আরবী, ফার্সী ও সংস্কৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যয় করা হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত বাণিজ্য ভারত ও বাংলাদেশের অনুকূলেই ছিল। ১৮১৫ সালে যখন রামমোহন রায় কলকাতায় চারটি বাড়ী কিনে বাস করার জন্য উঠে এলেন, তখন ভারত থেকে য়ুরোপে রপ্তানী বস্ত্রের মূল্য ছিল ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার মতো। এই রপ্তানী কমতে কমতে ১৮৩২ সালে রামমোহন যখন বিলেতে পার্লামেন্টের সমক্ষে ভারত সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছেন সেই সময় রপ্তানী বস্ত্রের মূল্য নেমে দাঁড়িয়েছিল ১০ লক্ষ টাকায় এবং তার কয়েক বছর পরে তা শূন্যে বিলীন হয়ে যায়। ১৮০০ সালে বিলেত থেকে এদেশে এক গজ কাপড়ও আসত না, ১৮১৪ সালে প্রথম বস্ত্র চালান হয়ে এলো ম্যানচেস্টার থেকে (প্রভাত ১২:২৬)। এদেশে ইংরেজ উপনিবেশবাদী শাসন ও লুণ্ঠনের ইতিহাসের জন্য দেখুন (দত্ত ১৩), (চন্দ্র ১৪), (ইসলাম ১৫)।

এডামের মন্তব্য, উপসংহার ও সুপারিশমালা:

এডামের তৃতীয় রিপোর্টটি অসাধারণ। এটি তিনি জমা দেন কলকাতায় ২৮ এপ্রিল ১৮৩৮। তিনি যেন মিশনারী উৎসাহ নিয়ে সত্য উদ্‌ঘাটনের কাজে নেমেছিলেন। বাংলা ও বিহারের যত রকমের স্কুল ছিল, জেলাওয়ারী তাঁর রিপোর্ট ও পরিসংখ্যান বহু ছকের সাহায্যে সকলের বোধগম্য করে তোলেন। যেসব স্কুলে ইংরেজী পড়ানো হতো অথবা এতিম, বালিকা ও শিশুদের জন্য যেসব স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেসব স্কুল সম্পর্কে সাধারণ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজী ভাষার প্রয়োগ ও সম্ভাবনার বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ মন্তব্য করেন। শিক্ষার বাহন হিসেবে ইংরেজী ভাষা যে কত বড় অবৈজ্ঞানিক ও গণবিরোধী সিদ্ধান্ত, সে-কথা তাঁর মন্তব্যে সরাসরি বলতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নি। তিনি বলেন:

পর্যবেক্ষণ এক: "It is impossible for me fully to express the confirmed conviction I have acquired of the utter impracticability of the views of those, if there are any such, who think that the English language should be the sole or chief medium of conveying knowledge to the natives...Let him traverse a pergunnah, a thana, a district, from north to south, from east to west, and in all directions. Let him note how village appears after village, before and behind, to the right hand and to the left, in endless succession. how numerous and yet how scattered the population, how uniform the poverty and the ignorance, and let recollect that this process must be carried on until he has brought within the view of his eye or of his mind about ninety or hundred million of people diffused over a surface estimated to be equal in extent to the whole of Europe. It is difficult to believe that it should have been proposed to communicate to this mass of human beings through the medium of a foreign tongue all the knowledge that is necessary for their higher civilization, their intellectual improvement, their moral

guidance, and their physical comfort, but since much has been said and written and done which would seem to bear this interpretation, and since it is a question which involving the happiness and advancement of millions will not admit of compromise, I deem it my duty to state in the plainest and most direct terms that my conviction of the utter impractability of such a design has strengthened with my increased opportunities of observation and judgement." (Adam 1: 308)

যাঁরা ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে এদেশের মানুষের মধ্যে ইউরোপীয় জ্ঞানের বিস্তার ঘটাতে চান, এডাম তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে বুঝতে পারেন যে তা অসম্ভব। দারিদ্র্য ও অজ্ঞানতা যে দেশের মানুষের সমস্ত চিন্তাশক্তিকে পঙ্গু করে রেখেছে, তাঁর পক্ষে এটা বিশ্বাস করা বেশ কষ্টকর যে তাদের সভ্যতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়ন এবং তাদের নৈতিক ও শারীরিক কষ্ট লাঘবের জন্য কোনো বিদেশী ভাষার মাধ্যমে তাদের কাছে জ্ঞান-সম্পদ পৌঁছানো যাবে। এটা তিনি কিছুতেই বুঝতে পারেন না। বলেন, "এটা আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে যে সরাসরি ও সহজতম ভাষায় আমার মতামত তুলে ধরা। এ জ্ঞান আমি দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও যুক্তির মাধ্যমে অর্জন করেছি।"

পর্যবেক্ষণ দুই: এমনটা মনে করা ভুল হবে যে এডাম সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী ভাষার মাধ্যমে এদেশে মধ্যযুগীয় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখার সমর্থক ছিলেন। মোটেই তা নয়। স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলেন, "Although the English language cannot become the universal instrument, European knowledge must be the chief matter of instruction." (Adam 1: 308)|

তিনি বাংলার দেশজ সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমেই এদেশের সাধারণ মানুষের মাঝে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার কামনা করেছিলেন। কোন ধর্ম শিক্ষার প্রতিষ্ঠান নয়, দেশজ সাধারণ শিক্ষা বলতে তিনি সেইসব প্রতিষ্ঠানকে বুঝিয়েছিলেন যেখানে সেক্যুলার শিক্ষা প্রদান করা হতো। যেমন পাঠশালা, ফার্সী স্কুল, ইত্যাদি। অর্থাৎ তিনি ফর্মটা বজায় রেখে 'কনটেন্ট' পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন যা সমগ্র দেশবাসীর কাছে দীর্ঘদিনের সুপরিচিত ছিল। সে সময় খ্রিস্টধর্ম প্রচারকে দেশবাসী ভয় করতো। ইংরেজদের যে কোন কাজকেই তারা সন্দেহের চোখে দেখতো। পুরনো কাঠামোর মধ্যে নতুন ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্তি মানুষের ভয় ও সন্দেহ লাঘবে যথেষ্ট সাহায্য করত বলে মনে করেন এডাম। তিনি আশা প্রকাশ করেন, "But if this measure will prove important and useful, as it undoubtedly will, standing alone and by itself, its importance and utility will be incalculably increased if followed by the establishment of a national system of instruction through the medium of the vernacular tongue. If the use of the language of the people will enable every man to understand the statement of his own case, even when he is wholly ignorant of his mother tongue except as a spoken language, how much more complete his protection will it be if he knows it as a written language." (Adam 1: 417)

তাঁর বক্তব্যই প্রমাণ করে যে তিনি তাঁর প্রস্তাব নিয়ে কতটা আশাবাদী ছিলেন। তাঁর এই সুপারিশ সন্দেহাতীতভাবে সফল হতো, তিনি বিশ্বাস করতেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী কূটচালে তাঁর সে স্বপ্ন ধ্বংস হয়ে যায়। সেই সঙ্গে ধ্বংস হয়ে যায় বাংলাদেশে বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ ও মাতৃভাষার মাধ্যমে সকলের জন্য একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার সম্ভাবনা। যে ক্ষুদ্র উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে ইংরেজীর মাধ্যমে ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল, সেই শ্রেণী তার শ্রেণীগত স্বার্থে আজও মাতৃভাষার মাধ্যমে একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে পারলো না। আশাহত এডাম পদত্যাগ করে ১৮৩৮ সালের শেষের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য চলে যান। জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন নিম্নলিখিত ভাষায় এডামের প্রস্তাবের নিন্দা জ্ঞাপন করে। "After a careful consideration of these propositions for the improvement of the rural schools, we fear that the execution of the plan would be almost impracticable; in consequence of the complicated nature of the details, which would also involve much more expense and difficulty than Mr. Adam has supposed." (Adam 1: liv) এবং তারা তাদের পূর্বের সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনি করে বলে, "A further experience and a more mature consideration of the important subject of education in this country has led us to adhere to the opinion formerly expressed by us, that our efforts should be at first concentrated to the chief towns or Sudder stations of districts and to the improvement of education among the higher and middling classes of the populace, in the expectation that through the agency of these scholars an education reform will descend to the rural vernacular schools, and its benefits be rapidly transfused among all those excluded in the first instance by abject want from a participation in its advantage." (Adam 1 : liv-lv)|

কিন্তু পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করে যে মাতৃভাষার মাধ্যমে একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার এডামের দাবীর যৌক্তিকতা কেউ-ই অস্বীকার করতে পারে নি। এমন কি 'জেনারেল কমিটি' এডামের প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করলেও কমিটি পরীক্ষামূলকভাবে ২০টি বাংলা স্কুল খোলার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। অবশ্য তাদের উদ্দেশ্যটা সৎ ছিল না। ছিল ষড়যন্ত্রমূলক। ২০টি স্কুল খোলার পর সেগুলোকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে প্রমাণ করা যে কেবল মাতৃভাষার মাধ্যমে কোনো শিক্ষানীতি এদেশবাসীর কাছেও গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু সরকার সে প্রস্তাবটিও নাকচ করে দেয়। এডামের প্রস্তাবটির গুরুত্ব উপলব্ধি করেন পরবর্তী গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ। তখন 'পরিস্রাবণ নীতি' বাস্তবায়নের যুগ। তারই মধ্যে হার্ডিঞ্জ ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে ১৬ ডিসেম্বর একটি সরকারী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বাংলা, বিহার ও কটকে ১০১টি মাতৃভাষার স্কুল প্রতিষ্ঠার

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রায় একই সময় নবগঠিত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেঃ গভর্নর জেমস থমাসন সেখানে কোন বিদেশী ভাষা নয়, মাতৃভাষার মাধ্যমে একটি জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন, 'through the medium of the vernacular language and not through that of any foreign tongue.' তিনি এডামের প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন এবং তাঁর তৃতীয় রিপোর্টের সুপারিশমালার প্রয়োজনীয় অংশ পুনর্মুদ্রণ করে বিতরণ করেন। থমাসনের শিক্ষানীতি ইতিহাসে 'হাল্কাবন্দী' নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। আমরা হার্ডিঞ্জ স্কুল নিয়েই আলোচনা করবো। অনেক কাঠখড় পোড়ানো সত্ত্বেও পরিণতিতে হার্ডিঞ্জ স্কুলও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় বিলেতের কোম্পানীর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিমাতাসুলভ আচরণে। সে কথায় পরে আসি। হতে পারে লর্ড হার্ডিঞ্জের আন্তরিকতা ছিল। কিন্তু কোর্ট অব ডাইরেক্টরস তাঁর মাথার ওপর বসে ছিল। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন এন.এল.বসাকের বই-এর বার অনুচ্ছেদ। (Basak 2: 385-426)। ওই স্কুলগুলোকে ব্যর্থ প্রমাণ করাই ছিল সরকারের প্রধান দায়িত্ব। আপনি চারিদিকে ইংরেজী দোকান খুলে রাখবেন, ইংরেজী না জানলে আপনি কিছুই কিনতে পারবেন না, এমন পরিস্থিতিতে উচ্চ ও উঠতি মধ্য শ্রেণীর সন্তানেরা কেন মাতৃভাষা চর্চা করবে? সেটাই ঘটেছিল ১০১টা মাতৃভাষার স্কুলের ক্ষেত্রে। কি উদ্দেশ্যে লর্ড হার্ডিঞ্জ ১০১টা সরকারী মাতৃভাষার স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? বাংলার পরবর্তী লেঃ গভর্নর ফ্রেডারিক হ্যালিডে ১৮৫৩ সালের ২৫ জুলাই সংসদের সিলেক্ট কমিটির কাছে এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, "A general complaint that vernacular education was neglected, and a constant call upon the Government to do something towards existing vernacular education; there happened to be at that moment certain funds temporarily at the disposal of the Governor of Bengal which were applicable to that purpose and he so applied them." (Basak 2: 393)।

১৮৫৩ সালের ১০ জুন রেভা: জে.সি. মার্শম্যান একই কমিটির কাছে এই বলে সাক্ষ্য দেন যে, হার্ডিঞ্জ স্কুল "commenced with a kind of presentiment that they would not succeed but the experiment had to be undertaken to meet the criticism of Government policy in this respect." (Basak 2: 393)। হার্ডিঞ্জের পরীক্ষা যে সফল হবে না, তা আগেই জানা ছিল, তবুও সরকারী সিদ্ধান্তকে সমালোচনার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সিদ্ধান্তটি নেয়া হয়েছিল। হার্ডিঞ্জের সিদ্ধান্তটি নেয়া হয়েছিল, "to counter the criticism that vernacular education had been neglected by Government"। গণশিক্ষার কোনো ব্রত নিয়ে হার্ডিঞ্জ স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয় নি।

হার্ডিঞ্জ স্কুল সম্পর্কে কিছু তথ্য। ১৮ডিসেম্বর ১৮৪৪ সালের সিদ্ধান্ত অনুসারে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির সাতটি বিভাগের ৬টি জেলায় ১০১টি মাতৃভাষা স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে। সম্পদের অভাবের কারণে স্কুলগুলো হবে ছোট। হার্ডিঞ্জ স্কুলের অর্থ কোথা থেকে আসবে? কাউন্সিল অব এডুকেশনের মাধ্যমে শিক্ষার জন্য যে বরাদ্দ দেয়া হয়, সে অর্থ হার্ডিঞ্জ স্কুলের জন্য খরচ করা যাবে না। 'নিম্ন পরিস্রাবণ' নীতি অনুসারে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির বিভিন্ন জেলা সদরে জিলা স্কুল ও প্রাদেশিক কলেজের পিছনে ব্যয় করা হবে। তাহলে লর্ড হার্ডিঞ্জ ১০১টি স্কুল পরিচালনার অর্থ পেলেন কোথায়? সেই সময় গভর্নর জেনারেলের কাছে কিছু উদ্বৃত্ত অর্থ ছিল, সেই অর্থ দিয়েই তিনি মাতৃভাষার ১০১টি স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। যেহেতু মাতৃভাষার স্কুল মেকলের শিক্ষানীতিতে ছিল না, সুতরাং সে স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব নিতে কোর্ট অব ডাইরেক্টরস রাজী নয়; তাই একথা বলা যায়, ১০১টি মাতৃভাষার স্কুল গভর্নর জেনারেল হার্ডিঞ্জের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা। অর্থের অভাবে সেগুলো শুরু থেকেই সংকটাপন্ন ছিল। পরীক্ষামূলকভাবে একেবারেই সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠিত এই সব স্কুল সরকারের বিমাতাসুলভ ব্যবহারে শুরু থেকে অর্থ-সংকটে ভুগতে থাকে।

কোর্ট অব ডাইরেক্টরস প্রতি স্কুলের জন্য একজন করে শিক্ষক নিয়োগের অনুমতি দেয়া এবং তিন শ্রেণীর শিক্ষকের বেতন নির্ধারণ করে মাসে ২৫ টাকা করে ২০ জন, ২০ টাকা করে ৩০ জন এবং ১৫ টাকা করে ৫১ জন। এই অল্প বেতনে অধিকাংশ স্কুলেই ভাল শিক্ষক পাওয়া কষ্টকর হয়। চারটি গ্রেডে সেখানে বাংলা, হিন্দী ও উর্দু ভাষা পড়ানো হতো। অধিক সংখ্যক ছাত্র-ভর্তির জন্য বিনা বেতনে ছাত্র-ভর্তির আবেদন নাকচ করা হয় এই কারণে যে, বেতন নিলে সমভ্রান্ত বংশীয় ছাত্ররা ভর্তি হবে। বেতন না নিলে দরিদ্র, নিম্নশ্রেণীর ছেলেরা ভর্তি হতে উৎসাহী হবে। এ সিদ্ধান্তে পরিষ্কার হয়ে যায় মাতৃভাষার স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল সমাজের উঁচু সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর ছাত্রদের শিক্ষার জন্যই; গরীব, নিম্নশ্রেণীর জন্য নয়। 'নিম্ন পরিস্রাবণ নীতিরই ছায়া লক্ষ্য করা যায় এখানে 'there was no idea of initiating a system of mass education through Hardinge Schools.' (Basak 2: 393)। যেখানে মধু সেখানেই মাছি। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির বিভিন্ন স্থানের স্কুল থেকে এই বলে আবেদন আসতে থাকে যে স্কুল টিকিয়ে রাখতে হলে ছাত্র বেতন মওকুফ করতে হবে এবং স্কুলগুলো জেলা সদরে স্থাপন করতে হবে। দু'টি আবেদনকেই নাকচ করা হয়। এছাড়া চাকরী-বাকরী, ব্যবসা-বাণিজ্যে ইংরেজী ভাষার আধিপত্য বৃদ্ধির সাথে সাথে এদেশের মানুষের মধ্যে মাতৃভাষায় শিক্ষা নয়, ইংরেজী ভাষায় শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ দিন দিন প্রবল হয়ে ওঠে। পাবনা-ফরিদপুরের সরকারী মাতৃভাষার স্কুল এলাকাবাসী বর্জন করে এবং সরকারী ইংরেজী স্কুলের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর ফলে মাতৃভাষার সরকারী স্কুল অস্তিত্ব সংকটে পড়ে। যশোরের কমিশনার সুপারিশ করে মাতৃভাষার পাশাপাশি যদি বিনা বেতনে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে ১০১টি স্কুলের টিকে থাকার সম্ভাবনা উজ্জল হবে (Basak 2: 397)। কিন্তু সরকার বিনা বেতনে শিক্ষা প্রদান নীতির বিরোধী, "contrary to the principle of the scheme to bestow Gratuitous education." (Basak 2: 399)। ঢাকা জেলা কমিশনার যখন শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব দেন, তখন বোর্ড মনে করে যে তাদের অনেক বেশী বেতন দেয়া হচ্ছে। ঢাকার কমিশনার জে. ডানবার প্রস্তাব করেন যে মাতৃভাষার

পাশাপাশি ইংরেজী শেখানো উচিত। বোর্ড বলে যে এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা: altogather a wrong view'। তারপর যা বলে তা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। এডামের কথার প্রতিধ্বনি করে বোর্ড বলে, "The instruction of the millions in India, if practicable at all, can only be imparted through the medium of the vernacular". (Basak 2: 399)। বোর্ড এ সিদ্ধান্ত জানায় ১৮৪৭ সালের ৩১ আগস্ট। মেকলের প্রস্তাব গৃহীত হবার ১২ বছর পর বোর্ড এই সিদ্ধান্ত নিল। গণশিক্ষায় মাতৃভাষার স্থান সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ক্রমশ মুখ খুলতে শুরু করে। ১৮৪৯ সালের ২০ ডিসেম্বর সরকার যে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয় তা হলো "frequent suggestion made for converting the vernacular schools wholly or partially into additional Zillah Schools for teaching of English." (Basak 2:402)।

ইংরেজী শেখানোর জন্য মাতৃভাষার স্কুলগুলোকে অতিরিক্ত জেলা স্কুলে পরিণত করার প্রস্তাব বিবেচনা করা সম্পর্কে যশোরের কমিশনার বলে যে, "To give value in the eyes of the native by combining instruction in the rudiments of English with the instruction in the Vernacular Schools." (Basak 2: 402)। কিন্তু তা মাতৃভাষার স্কুল সম্পর্কে সরকারী নীতি ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।

সরকারের ভাষ্য এই যে এদেশবাসীর ইংরেজী শেখার আগ্রহ লক্ষ্য করে সরকার যা করার ইতিমধ্যে তা করেছে; কিন্তু "it was not the object of the government nor could it be practical, nor if practical, would it be useful, to teach the mass of the people of Bengal, English". (Basak 2: 403)। বাংলার সকল মানুষকে ইংরেজী শেখানোর প্রস্তাব শুধু অবাস্তবই নয়, উপকারীও হবে না। বসাক বলছেন, "This statement in the resolution of 1849, shows that Government had now come to realize that English, a foreign language, however desirable it might be for the selected few, could never become the medium of mass education in this country." (Basak 2: 403)। এতদিনে সরকার বুঝতে পেরেছে যে ইংরেজী একটি বিদেশী ভাষা। এই ভাষার মাধ্যমে সমাজের উঁচুতলার বাছাই করা কিছু মানুষের শিক্ষার চাহিদা মেটানো সম্ভব; ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে এদেশের গণশিক্ষা মোটেই প্রচলন সম্ভব নয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে ইংরেজীর দাবী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় মাতৃভাষার স্কুলগুলোর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। মাতৃভাষার কোন আর্থিক মূল্য নেই– অন্যদিকে ইংরেজী ভাষার মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বোর্ডের অনুমোদন ব্যতিরেকেই বিভিন্ন স্থানে মাতৃভাষার স্কুলগুলোতে মাতৃভাষার পাশাপাশি ইংরেজী শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়, একান্তই ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্কুলগুলো চালু রাখার স্বার্থে। সরকার নীতিগতভাবে সমর্থন না করলেও ইংরেজী ক্লাস বন্ধ করে দেয় নি। বাংলা স্কুলগুলোতে মাতৃভাষার সাথে ইংরেজীও শেখানো হতে থাকে। ছাত্রদের ঝোঁক ইংরেজী শেখা। সরকার শুধু বলে ইংরেজী যেন দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে পড়ানো হয়। ইংরেজী ভাষার কোনো পরীক্ষা নেওয়া যাবে না। কিন্তু ইংরেজী ভাষার প্রতি মানুষের আসক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য যা করণীয় সরকার তা সবই করে। কারণ কলকাঠি নাড়ার একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী ব্রিটিশ সরকারই। হার্ডিঞ্জ-স্কুল ক্রমশ তার পরিণতির দিকে এগুতে থাকে। ১৮৪৯ সালের বোর্ডের বাৎসরিক রিপোর্টে দেখা যায় স্কুলের সংখ্যা ৫৮-তে নেমে এসেছে এবং ১৮৫০ সালে ৪৩-এ এবং ১৮৫২ সালে মাত্র ৩৪-এ এসে দাঁড়ায়। ধীরে ধীরে হার্ডিঞ্জ প্রকল্প ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এ দিকে মিশনারী স্কুলগুলো এতদিন বাংলা ভাষার প্রতি যে আগ্রহ প্রকাশ করতো, বেন্টিংকের শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের পর তাঁরাও ক্রমশ ইংরেজীর প্রতি ঝুঁকতে থাকে। বিনা বেতনে মিশনারী স্কুলে ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ প্রদান মাতৃভাষার স্কুলের ধ্বংসের আর এক কারণ।

থমাসনের হাল্কাবন্দী স্কুল মাতৃভাষার মাধ্যমে একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার উইলিয়াম এডামের প্রস্তাবটি যে কতটা বিজ্ঞানসম্মত ছিল তা বুঝতে হলে নবগঠিত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের (U.P) লে. গভর্নর জেমস থমাসনের শিক্ষানীতিটা নিয়ে সামান্য আলোচনা করার দরকার। কারণ এডাম তাঁর রিপোর্টটি তৈরী করেছিলেন বাংলা, বিহার ও কটকের (উড়িষ্যা) জন্য। কিন্তু বাংলা সরকার সে রিপোর্টটি গ্রহণ করে নি। নিন্দা করেছিল। ১৮৫৪ সালে উডের ডেসপাচে যখন এডামের রিপোর্টের আলোকে নতুন শিক্ষানীতি প্রণীত হয়, তখন তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। কেননা মেকলের শিক্ষানীতির মাধ্যমে এতদিনে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি এদেশবাসীকে বৈষয়িক ও মানসিকভাবে এতটাই মাতাল করে তোলা হয়েছে যে সত্যিই এডামের প্রস্তাব তখন এদেশবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় নি। বাংলাদেশের একটি শ্রেণীর কাছে এডামের প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি। আজও কি মনে হয়? তাই এডামের প্রস্তাবের বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে কিছু জানতে-বুঝতে চাইলে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে জেমস থমাসনের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে কিছুটা আলোচনা দরকার।

থমাসন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে মাতৃভাষার মাধ্যমে (হিন্দী ও উর্দু) যে গণশিক্ষা নীতি গ্রহণ করেন, তিনি তার প্রেরণা পান উইলিয়াম এডামের প্রস্তাবের মধ্যে। সেকথা আগেই বলা হয়েছে। তিনি এডামের রিপোর্টের প্রয়োজনীয় অংশ পুনর্মুদ্রণ করে বিলি করেন। দীর্ঘদিনের পুরনো ঐতিহ্যবাহী সামন্তযুগীয় স্কুলগুলোকে অবজ্ঞা না করে বরং সেই কাঠামোর ওপরই তিনি মাতৃভাষার হাল্কাবন্দী স্কুল গড়ে তোলেন। পুরনো কাঠামোর অভ্যন্তরে কেবল বিষয়বস্তুর পরিবর্তন করে আধুনিক ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেন। হার্ডিঞ্জের সঙ্গে এখানেই তাঁর বড় ধরনের পার্থক্য। হার্ডিঞ্জ পুরনো পাঠশালাগুলোকে অগ্রাহ্য করে নতুন করে স্কুল নির্মাণ করেন। ১৮৪৯ সালের ৩ অক্টোবর লন্ডনের কোর্ট অব ডাইরেক্টরস্ থমাসনের হাল্কাবন্দী প্ল্যান অনুমোদন করে বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকা মঞ্জুর করে, তা ১৮৫৬ সালের ৮ মে স্কুলগুলোকে স্থায়িত্ব প্রদান করে এবং বাকি অর্ধেকটা দেন স্থানীয় জমিদাররা। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলায় শিক্ষাকর (সেস)

আদায় অসম্ভব করে তোলে এবং "জমিদার ইংরেজ যোগসাজশ এইভাবে প্রাথমিক শিক্ষার দিকে পদক্ষেপ রুখে দেয়"। (শাহেদল্লাহ ১৯ : ২৫)। এ ছাড়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ সরকার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। তাহলো, সকল সরকারী কর্মচারীদের জন্যে মাতৃভাষা পড়া ও লেখা বাধ্যতামূলক এবং সেই সঙ্গে সকল অফিসার ও পাটোয়ারীদের জন্য গণিত ও ভূমিমাপন বিদ্যা অবশ্য শিক্ষণীয়।

বাংলা সরকার এতদিনে থমাসনের সাফল্যে অনুপ্রাণিত বোধ করে এবং কাউন্সিল সদস্য ড. মোয়াটকে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গিয়ে ভিজিটর-জেনারেল এইচ. এস. রীডের সঙ্গে দেখা করে 'হাল্কাবন্দী' শিক্ষা ব্যবস্থা সরজমিনে দেখে আসার জন্য প্রেরণ করে। ১৮৫২ সালে মোয়াট উত্তর পশ্চিম প্রদেশে সফর করেন এবং ১৮৫৩ সালের ৪ঠা জুন তাঁর রিপোর্ট পেশ করেন। বাংলার হার্ডিঞ্জের স্কুলের ব্যর্থতার কথা তুলে ধরে তিনি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের হাল্কাবন্দী পদ্ধতির ভূয়সী প্রশংসা করেন: "admiration at the real, solid advance and firm root taken by Mr. Reids system." এবং সুপারিশ করেন বাংলা ও বিহারের জনগণের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের জন্য ওই পদ্ধতিই সর্বোৎকৃষ্ট। সেই সঙ্গে তিনি ঘোষণা দেন যে হাল্কাবন্দী পদ্ধতি "so simple and complete as to merit immediate extension in the North Western Provinces and gradual introduction into Bengal and Behar" তিনি বাংলার জনগণের জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার একটি পরিকল্পনা তৈরী করে সরকারের কাছে জমা দেন (Basak 2 : 414)।

ভূমিকায় তিনি স্বীকার করেন যে এতদিন বাংলায় কেবল উঁচুশ্রেণীর মানুষকে ইংরেজী শিক্ষা দেয়া হতো এবং স্কুল শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য 'নার্সারি' স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হতো; এবং এভাবে একটি ইংরেজীশিক্ষিত বাঙালী শ্রেণী গড়ে তোলা হচ্ছিল । যারা তাদের প্রশিক্ষণ বা সনদের শক্তিতে দেশজ ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অনায়াসে দরিদ্র-অযোগ্য শিক্ষকদের সরিয়ে দিতো। ইংরেজী শিক্ষিত উঁচু শ্রেণীর মানুষ সব কিছুতেই অগ্রাধিকার পেতো। সাধারণ মানুষের মাতৃভাষার শিক্ষকদের এভাবে অবহেলা করা হতো। সেই পাশ্চাত্যবাদী শিক্ষাধারা থেকে সরে এসে হার্ডিঞ্জ ১০১টি মাতৃভাষা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সেগুলো শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। কেন সেকথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। যেসব হার্ডিঞ্জ স্কুলে তখনও ২০ জনের বেশী ছাত্র ছিল, সেগুলো ছাড়া সব হার্ডিঞ্জ স্কুল বন্ধ করার প্রস্তাব করেন ড. মোয়াট। মোয়াট কাউন্সিল অব এডুকেশনের তখনকার অভিমত প্রতিধ্বনি করে বলেন, "any scheme of Vernacular Education for Bangal to be successful must be based upon the existing institution of the country." এডামের সিদ্ধান্তেরই প্রতিধ্বনি শোনা যায় বাংলা সরকারের কণ্ঠে: "The village school with all its imperfections was a time honored institution." এদেশে মাতৃভাষা শিক্ষার জন্য সে সব প্রতিষ্ঠানের চরিত্রের পরিবর্তন এবং দেশজ পাঠশালার উন্নয়ন প্রয়োজন।

এরই মধ্যে ভারত সরকারের ১৮৫৩ সালের ৪ নভেম্বরের নির্দেশনামা চলে আসে। সেখানে গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসির ১৮৫৩ সালের ২৫ অক্টোবরের মিনিটের একটি কপি সংযুক্ত ছিল। ডালহৌসি থমাসনের পরিকল্পনার ভূয়সী প্রশংসা করেন। এবং ড. মোয়াটের প্রস্তাবের সঙ্গে ঐকমত্য প্রকাশ করে বলেন যে, মোয়াটের প্রস্তাবটি "not only the best adopted to leave the ignorance of the agricultural population of the North Western Provinces"; সে প্রস্তাবটি "also the plan best suited for the Vernacular Education of the mass of the people of Bengal and Behar (Basak 2: 417)। শেষে বাংলা সরকারকে তা কার্যকর করার নির্দেশ দেন এবং বলেন, "Financial considerations no longer shackle the progress of Government." ভারত সরকারের চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সরকার ১৮৫৩ সালের ১৯ নভেম্বর এক চিঠিতে কাউন্সিল অব এডুকেশনের কাছে রীড ও এডামের প্রস্তাব সম্পর্কে জানতে চায়। সরকার হার্ডিঞ্জের ১০১টি মাতৃভাষার স্কুলের অভিজ্ঞতার আলোকে এডাম ও রীডের প্রস্তাবকে বিচার করতে চায় এবং বলে "such as may appear best calculated to answer the object proposed by the Government of India and to provide the most efficacious means of founding and maintaining a sound and well adapted system of Vernacular Instruction in all the provinces under the Government. (Basak 2: 417) এভাবে বাংলা ও বিহারে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের থমাসনের হাল্কাবন্দী সিস্টেম চালু করার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু এখানে একটি কথা স্মরণ করতে হয়। তাহলো প্রাথমিক সাফল্যের পরও ইংরেজী ভাষার চাপে হাল্কাবন্দী পদ্ধতি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

১৮৫৪ সালে বাংলা প্রদেশে লে. গভর্নর পদ সৃষ্টি হয় এবং প্রথম লে. গভর্নর হিসেবে যোগ দেন ফ্রেডারিক জে. হ্যালিডে। ছোটলাট হবার আগে তিনি কাউন্সিল অব এডুকেশনের সদস্য ছিলেন। সেই সময় তিনি বাংলা শিক্ষার পক্ষে তাঁর মতামত একটি পরিকল্পনায় ব্যক্ত করেছিলেন। হ্যালিডের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৫৪ সালের ৭ ফেব্রুয়ারী বাংলাশিক্ষা প্রচলনের জন্য একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা রচনা করেন। বিদ্যাসাগর বলেন যে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে বাংলা ভাষার শিক্ষা প্রচলন করা উচিত। পরিকল্পনার প্রথমেই তিনি বলেন: ১. বাংলা শিক্ষার বিস্তার ও সুব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয়। তা না হলে দেশের কল্যাণ হবে না। ২. কেবল লিখন-পঠন ও গণনা বা সরল অঙ্ক কষার মধ্যে বাংলা শিক্ষা সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। যতদূর সম্ভব বাংলাভাষাতেই সম্পূর্ণ শিক্ষা দিতে হবে এবং তার জন্য ভূগোল, ইতিহাস, জীবনচরিত, পাটীগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, নীতিবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শারীরিকবিজ্ঞানও বাংলায় শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন (ঘোষ ১৭ : ১৯৯, উমর ১৮ : ৩১)। উক্ত পরিকল্পনায় তিনি কিছু বই-এর নামও উল্লেখ করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবে অনুপ্রাণিত হয়ে হ্যালিডে ১৮৫৪ সালের ২৪ মার্চ এক সিদ্ধান্তে ঘোষণা করেন : "the object of the Government should be

to improve the vast number of indigenous schools which, on all evidence, still exist in the province of Bengal". (Basak 2 : 419)। তিনিই প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে অনুদান প্রথা (Grant-in-Aid) চালু করার প্রস্তাব করেন। মাত্র ক'দিন পরে উডের ডেসপাচে সেই সিদ্ধান্তটিই নেওয়া হয়। ১৮৫৪ সালের ১৯ জুলাই প্রেরিত ডেসপাচে সর্বোচ্চ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ প্রথমবারের মত ভারতে ইংরেজীর পাশাপাশি মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষানীতি ঘোষণা করে। কোর্ট অব ডাইরেক্টরস বলে, The object of education policy in India would be the diffusion of European Knowledge which could be imparted through the media of both English and Vernaculars. এতদিনে তাদের হুঁশ হয় যে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষার মাধ্যমে কোন জ্ঞান চর্চাই সম্ভব নয়। এই ঘোষণার মাধ্যমে তারা অতীতে উইলিয়াম এডামের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষানীতি বর্জন করার পাপ স্খলন করতে চায়। অতীতের শিক্ষানীতি যে ভ্রান্ত ছিল সে কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। বসাক বলছেন, "Apparently the Directors of the East India company now seemed to realize the harm done to the cause of mass education by this wrong policy which favoured the few at the cost of the many (Basak 2: 423)। ১৮৩৫ সালের মাত্র ২০ বছর পরে সরকারের অফিসিয়াল শিক্ষানীতির বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে। ১৮৫৪ সালের উডের ডেসপাচে বাংলা সরকারের প্রতি জোর আহ্বান জানানো হয়, ভারত-সরকারের শিক্ষানীতির দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য বলা হয়, "the attention of the Government of Bengal should be seriously directed to the consideration of some plan for the encouragement of the indigenous school, and for the education of the lower classes, which like of Thomason in the North Western Provinces, may bring the benefit of education practically before them, and assist and direct their attention." (Basak 2:424)। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলা সরকার সে আহ্বানের প্রতি তেমন গুরুত্বারোপ না করে পাশ্চাত্যবাদী ভ্রান্ত শিক্ষানীতিই অনুসরণ করেছে। আরো কুড়ি বছর পার হবার আগে বাংলা সরকার জনসাধারণের শিক্ষার জন্য তেমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি। স্বাধীন বাংলাদেশেও মাতৃভাষার শিক্ষা আজও গুরুত্বহীন হয়েই রয়েছে। আজ উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর সবাই ইংরেজীর পিছনে ধাবমান।

উপসংহার: বিনয় ঘোষ বলছেন, "কেউ কেউ টোমাসনকে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার আদি প্রবর্তক বলে অভিনন্দন জানিয়েছেন। কিন্তু সুবিচার করতে হলে এই সম্মান পাদ্রী এডামের প্রাপ্য। এডাম কোনো সরকারী সমর্থন বা উৎসাহ পান নি, তাই তাঁর সুচিন্তিত রিপোর্ট ও পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত বাজে কাগজের স্তূপে সমাধিস্থ হয়েছিল" (ঘোষ ১৭ : ১৯৯)। বর্তমান আলোচনায় বিনয় ঘোষের সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়েছে। ১৮২৩ সালে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে রামমোহন রায় যে শিক্ষানীতি ঘোষণা করেছিলেন, ১৮৩৫ সালে মেকালে ও বেন্টিংকের হাতে তা বাস্তবায়িত হয়। আর ১৮৩৫ সালে মাতৃভাষার মাধ্যমে একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার যে সুপারিশ করেছিলেন পাদ্রী উইলিয়াম এডাম, ১৮৫৪ সালে উডের ডেসপাচে তার বাস্তবায়ন শুরু হয়। থমাসন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহে যে হাল্কাবন্দী স্কুল গড়ে তুলেছিলেন, তার প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন এডামের রিপোর্ট থেকে। এডামের সুন্দর বৈজ্ঞানিক রিপোর্টি বাজে কাগজের স্তূপে ফেলে দিয়ে মেকলে ও বেন্টিংক বাংলা তথা ভারতের সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন, চরম ক্ষতি সাধন করেছিলেন, যে ক্ষতি আমরা আজও পুষিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়েছি।

উপসংহারের পরে

উপসংহারের পরেও আরও কথা থাকে। সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশগুলোতে তার ক্ষমতা সংহত করার জন্যে নিত্য নতুন পন্থা আবিষ্কার ও অবলম্বন করে। তার মধ্যে রাজনীতি ও অর্থনীতি প্রধান। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে আমেরিকা হারানোর পরে, সাম্রাজ্যবাদ ভালভাবেই বুঝতে পারে যে এক সময়ে পৃথিবীর সমস্ত উপনিবেশ তাদের হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। তখন উপনিবেশগুলোর ওপর তার রাজনৈতিক প্রভাব ও অর্থনৈতিক শোষণের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। তাই ক্ষমতা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে তার উপনিবেশবাদী শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্যে ছিল আরও একটি অস্ত্র। তা হলো অধিকৃত অঞ্চলের সংস্কৃতির উপনিবেশিকরণ। অনেক সমাজ ও নৃবিজ্ঞানী একে সাংস্কৃতিক উপনিবেশবাদ বলে অভিহিত করেন। যেমন গ্রামসি (১৯৭১), ফুকো (১৯৮০), সাঈদ (১৯৯৩), Cohn (১৯৯৬), মেটকাফে (১৯৯৫), নিরঞ্জন (১৯৯২), সিং (১৯৯৬) সহ আরও অনেকে।

উপনিবেশবাদ এখন পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। সম্ভবত ভারতবর্ষই প্রথম উপনিবেশ প্রায় দু'শো বছর সাম্রাজ্যবাদী শোষণের পর ১৯৪৭ সালে সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে বেরিয়ে এসে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে। তখন ভারতবর্ষের রাজনীতি ও অর্থনীতির ওপর সাম্রাজ্যবাদের সরাসরি হস্তক্ষেপের সুযোগ আর থাকে না। কিন্তু তারপরও সাংস্কৃতিক উপনিবেশবাদ অব্যাহত রাখা অসম্ভব ছিল না। তাই দীর্ঘ উপনিবেশিক আমলে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো উপনিবেশসমূহের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির রূপান্তরের জন্য অর্থ, শ্রম ও বুদ্ধি নিয়োগ করে; ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে যেন ঔপনিবেশিক শাসনাবসানে সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশগুলোর ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির ওপর তার আধিপত্য রাখতে পারে। ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিই তখন হয়ে ওঠে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের প্রধান হাতিয়ার। আন্দোলন-সংগ্রাম-বিপ্লবের মাধ্যমে উপনিবেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিকে মুক্ত করাটা সহজ, কিন্তু সাংস্কৃতিক উপনিবেশবাদ ধ্বংস করা কঠিন।

তাই ১৮৩৫ সালে এদেশে আধুনিক শিক্ষার গাড়িটি চালু করার মুহূর্তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উদার মতাবলম্বী বলে পরিচিত মেকলে তাঁর শিক্ষা-প্রতিবেদনে আশা প্রকাশ করেছিলেন এই বলে যে, "We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons Indian in blood and colour,

but English in taste, in opinion, in morals and in intellect." 'প্রফেটিক' প্রত্যাশা! ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীনতা লাভ করে। মেকলে শ্রেণী-সৃষ্টির যে বীজ বপন করে গিয়েছিলেন সেই শ্রেণীর বয়স আজ ১৮০ বছর। তারাই আজ সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের সমর্থক, ধারক ও বাহক। এদের স্বগোত্রীয়দের সহযোগিতাতেই পৃথিবীর প্রাক্তন উপনিবেশগুলোতে আজও সাম্রাজ্যবাদ টিকে আছে ও তাদের শোষণ চালিয়ে যেতে পারছে। বাংলাদেশের জন্যও একথা সত্যি। রঙে-রক্তে বাঙালী, কিন্তু স্বাদে, বিশ্বাসে, নৈতিকতায় এবং বুদ্ধিতে বাদামী সাহেবরাই এদেশে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের গাড়ি সচল রেখেছে।

তথ্যপঞ্জি


১. William Adam. Reports on the State of Education of Bengal (1835 & 1838), Edited by Anathnath Basu, University of Calcutta, 1941

২. N.L.Basak, History of Vernacular Education in Bengal (1800-1854)

Bharat Book Stall. Calcutta, 1974-

৩. Syed Nurullah and T.P.Naik. A Students History of Education in India (1800-1947). Macmillan & Co. Ltd. London, 1951

৪. পরমেশ আচার্য, বাংলার দেশজ শিক্ষাধারা, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৯৫

৫. Allan C. Orstein & Daniel U. Levine. An Introduction to the Foundations of Education, Second Edition, Houghton Mifflin Company, Boston, 1981

৬. সালাউদ্দীনউনিশ শতকে বাংলার সমাজ চিন্তা ও সমাজ বিবর্তন, ১৮১৮-১৮৩৫, রপনং,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০

৭. নীহাররঞ্জন রায়, উনিশ শতকী পুনরুজ্জীবন সম্বন্ধে কিঞ্চিত পুনর্বিবেচনা, জিজ্ঞাসা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, সম্পাদক শিবনারায়ণ রায়, বৈশাখ ১৩৮৭, কলকাতা

৮. Azizur Rahman Mallick, British Policy and Muslims in Bengal 1757. 1856 Bangla Academy, Second Edition, 1977

৯. Howell. A.P. Education in British India Prior to 1854 and in 1870-71. Calcutta, 1842

১০. শহিদুল ইসলাম, বিশ্ববিদ্যালয় ও স্বায়ত্তশাসন, শিক্ষাবার্তা প্রকাশনা, ২০০৮

১১. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৯০৯

১২. সজনীকান্ত দাস, বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩৬৯

১৩. R. Palm Dutt, India Today: Monisha, Calcutta, 1992

১৪. Bipan Chandra, Essays on Colonialism, Orient Longman, 1999

১৫. শহিদুল ইসলাম, ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ: মিথ ও বাস্তবতা, বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন কর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ, ঢাকা, ২০০৯

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সভ্যতার সংকট, রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০

১৭. বিনয় ঘোষ, বিদ্যা বাঙ্গালী সমাজ, ওরিয়েন্ট লংম্যান, (তিন খণ্ড একত্রে) জানুয়ারী, ১৯৭০

১৮. বদরুদ্দীন উমর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙ্গালী সমাজ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ১৯৭৪

১৯. সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, শিক্ষা ও শ্রেণী সম্পর্ক, সংস্কৃতি প্রকাশন, ১৯৮৭

ভাষা ও সাংস্কৃতিক উপনিবেশবাদের ওপর নিচের বইগুলো পড়ুন

২০. Said, E.W (1974) Orientalism, London. Routledge and Kegan Paul

২১. Said, E. W. (1993) Culture and Imperialism. London. vintage

২২. Foucault, M. (1980) Power/ Knowledge: Selected interviews and Other Writings, 1972-1977, New York, Pantheon

২৩. Foucault, M. (1979) Discipline and Punish: The Birth of Prison, New York: Vintage Books

২৪. Metcalf, T.(1995) Ideologies of the Raj Cambridge, Cambridge University Press (Indian Edition, New Delli, Foundation Books)

২৫. Ngugi wa Thiong'o (1986) Decolonizing the Mind: the Politics of Mind The Politics of Language in African Literature, London: James Curry

২৬. Rahim, S.A.(1986) Language as Power Apparatus Observation of English and Cultural Policy in Nineteenth Century India World English, 5(2/3).231-9

২৭. Niranjana, T (1993) History really beginning: The Compulsion of post-colonial pedagogy in Rs Rajan (Ed). The Lie of the Land: English Literary Studies in India Delli, Oxford University Press (pp 246-59)

২৮. Rajan, R. S(Ed), (1993) The lie of the Land: English Literary Studies in India, Delhi, Oxford University Press

২৯. Sing, J. (1996) Colonial Narratives/Cultural Dialogues : Discoveries of India in the Language of Colonialism, London, Routledge

৩০. Sulei, S. (1992) The Rhetoric of English in India, Chicago: University of Chicago Press

৩১. Viswanatian, G (1989) Masks of Conquest: Literary Study and British Rule in India, London, Faber and Faber

৩২. West, M. (1926) Bilingualism (With special reference to Bengal) Calcutta, Bareau of Education, India

৩৩. Aime Cesaire, (1950) Discourse on Colonialism, AAKAR 2010

৩৪. Alastair Pennycook. English and the Discourses of Colonialism, Routledge, London & New York, 1998, Taylor & Francis e-library. 2002

৩৫. Robert Phellipson, Linguistic Imperialism, Oxford University, Paris, 1992


*লেখক: শিক্ষাবিদ*

# কালের সাক্ষী আদু দা

## তোফাজ্জল হোসেন তারা

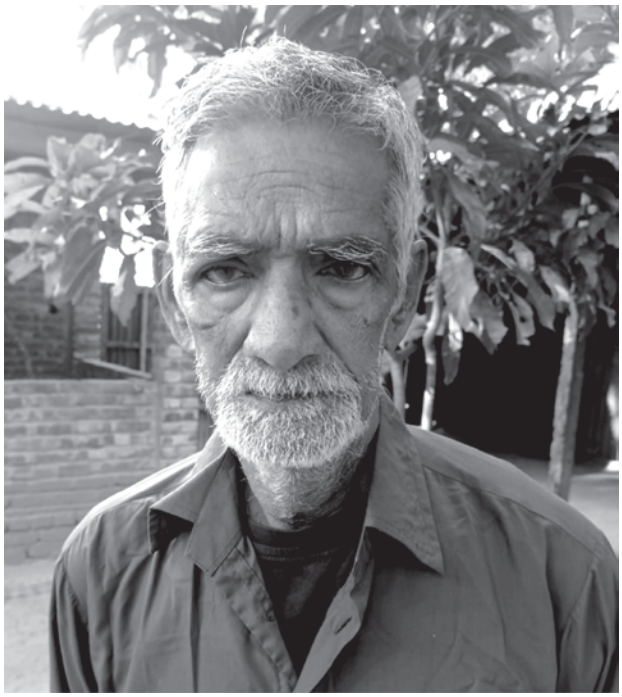

শ্রী আদ্যনাথ মালাকার (আদু দা)। আদু দার জন্ম নাটিয়াবাড়ি ১৯৩৬ সালে, বর্তমান বয়স ৮৬ বছর। বাপ দাদার বসতবাড়ি ছিল চর কল্যাণপুর। এক সময়ের প্রমত্তা খরস্রোতা যমুনা নদীর করাল গ্রাসে বসতবাড়ি ও গ্রাম নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। তখন তাঁর বাবা নাটিয়াবাড়ি এসে বসতি স্থাপন করেন। আদু দার শিশু-কিশোর জীবনের দুরন্তপনা দিনগুলি নাটিয়া বাড়িতেই কেটেছে। আদু দারা ছয় ভাই, এক বোন, তার মধ্যে তিনিই বড়। তিন ভাই ভারত চলে যায়, এক ভাই মারা যায়, এক ভাই সাভার হেমায়েতপুর বসবাস করে, আদু দা নাটিয়াবাড়িতেই বসবাস করেন। আদু দার স্ত্রীর নাম সুধারানী মালাকার, জীবিত আছেন। আদু দার তিন ছেলে, এক মেয়ে। আদু দা পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন নাটিয়াবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ধোবাখোলা করোনেশন হাই স্কুল ভেঙ্গে নাটিয়া বাড়ি নিয়ে আসলে আদু দা ১৯৬১ সালে স্কুলের দপ্তরী পদে চাকরি নেন। উনার সময়ে প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন মো. নুরুল ইসলাম চৌধুরী, তারপর ছিলেন বৃন্দাবন সাহা, তারপর ছিলেন আব্দুর রহমান মিয়া, তারপর ছিলেন রবীন্দ্রনাথ সরকার। রবীন্দ্রনাথ সরকার ভারত চলে যান, বাকি তিনজন দেশেই মৃত্যুবরণ করেছেন। তারপর ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে কর্মরত ছিলেন আব্দুল মালেক বিএসসি, মো. নুরুল ইসলাম, মো. আব্দুল বাতেন সেলিম স্যার। বর্তমান পূর্ণাঙ্গ প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে কর্মরত আছেন, আবু বকর সিদ্দিক স্যার। আদু দা ২০০৫ সালে চাকরি থেকে অব্যাহতি নেন।

দলছুট বন্ধুদের নিয়ে ছোলা পুরায়ে খেয়েছে আদু দা।

সস্তা দামে কালাইসিদ্ধ চিনার ভাত ও পারার ছাতু খেয়েছে আদু দা। টিনের ঘরের বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের পড়ালেখা করতে দেখেছে আদু দা। পোস্ট অফিসের বারান্দায় গিয়ে ডাক বাক্স থেকে চিঠি এনেছে আদু দা। বোর্ডিংয়ে থাকা ছাত্র ছাত্রীদের লেখাপড়া করতে দেখেছে আদু দা। গাছের ডাব ও খেজুরের রস চুরি করে খেয়ে ছাত্রদের পাগল ও মাতাল হতে দেখেছে আদু দা। হারিকেন ও কুপি জ্বালিয়ে ছাত্রদের পড়া লেখা করতে দেখেছে আদু দা। কত শীত, কত বর্ষা, কত ঝড়, কত ঋতু, কত বসন্ত, পার হতে দেখেছে আদু দা। কত শিক্ষক, কত গুণীজন, কত প্রভুর বুলি আওড়াতে হয়েছে আদু দার।

ডেকচি ও পাতিলে করে টিফিনের বিস্কুট বিতরণ করেছে আদু দা। সস্তা দামে চাল, চিনি, ঘি, তেল, দুধ, মাছ, মাংস ইত্যাদি খেয়েছে আদু দা। চিপা রাস্তা, খাল খননের পাড় দিয়ে হেঁটেছে আদু দা। আমরা চুরাশিতে সিক্সে ভর্তি হয়ে দেখেছি যে আদু দা, আজও ঠিক তেমনি অবয়বে আছে সেই আদু দা। এখন বিজ্ঞানের ভরা মৌসুম, বিদ্যুৎ, দালানকোঠা, অট্টালিকা, টেলিভিশন, টেপ রেকর্ডার, ল্যাপটপ, মোবাইল, ট্যাব , ডিভাইস, আরো কত কিছু হয়েছে, অন্ধকার যুগ পার হয়েও এসব দেখছে আদু দা।

বউচি, কানামাছি, গোল্লাছুট, হা-ডুডু, ইচিং-বিচিং, দারিয়া বান্দা, এগুলি খেলেছে আদু দা। সবচেয়ে বেশি ভালবেসেছেন আব্দুর রহমান স্যার। তাঁর পছন্দের রং সাদা বিধায় সব সময় সাদা ধুতি পরিধান করতে পছন্দ করতেন, তিনি ধূমপান করতেন না। এ এলাকার ইতিহাস ঐতিহ্য নিয়ে কালের সাক্ষী হয়ে এখনো জীবিত আছেন আমাদের আদু দা।

*লেখক: কবি ও লেখক*

# এক সফল কৃষানির গল্প

## মো. ইসরাফিল হোসেন

গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার আওতাধীন গাজীপুরা ইউনিয়নের ভুতুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা মোসা. ফজিলা খাতুন, স্বামী মো. শহিদুল ইসলাম। স্বামীর পৈতৃকভাবে পাওয়া ৩ বিঘা জমিতেই ফজিলা খাতুন ও তার স্বামী শহিদুল ইসলাম কৃষি কাজ করেন। এছাড়াও সময় সুযোগ মতো তার স্বামী পরের জমিতেও শ্রম বিক্রয় করেন। যদিও কৃষিই তাদের একমাত্র আয়ের পথ, কৃষি ফসল উৎপাদনের জন্য টাকা ও কৃষি বিষয়ক সঠিক পরামর্শের অভাবে কৃষি ফসলের ফলন ভালো হয়না। তাই এই কৃষি ও তার স্বামীর শ্রম বিক্রয়ের মজুরির থেকে তাদের যে পরিমাণ আয় হতো তা দিয়ে অনেক টানা-পোড়েনের মধ্য দিয়ে তাদের সংসার চলতো। তার পরিবারে মোট সদস্য সংখ্যা ৭ জন। ৩ মেয়ে ও ২ ছেলে এবং তারা স্বামী-স্ত্রী ২ জন। পারিবারিক অস্বচ্ছলতার জন্য ছেলে-মেয়ে ঠিকমতো পড়াশোনা করতে পারে না। প্রতিবেশীর নিকট থেকে ফজিলা খাতুন জানতে পারেন যে, সিদীপ নামে একটি সংস্থা আছে এবং সংস্থাটি দরিদ্র প্ররিবারের লোকদের বিভিন্ন ধরণের ঋণ দিয়ে থাকে যার কিস্তি প্রতি মাসে বা সপ্তাহে পরিশোধ করতে হয়। এছাড়া আরও একধরনের ঋণ দেয় যার কিস্তি ৬ মাস বা ১ বছর এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে পরিশোধ করতে হয়। এককালীন পরিশোধের এ বিষয়টি তার খুব ভাল লাগে এবং তার এ ঋণ নেওয়ার আগ্রহ জাগে। যেহেতু মাসিক বা সাপ্তাহিক কোন কিস্তি নেই, তাই ঋণ নিয়ে কোন কাজ করে এককালীন ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব। এ বিষয়টি ফজিলা খাতুন তার স্বামীর সাথে আলোচনা করেন এবং ঋণের টাকা দিয়ে তাদের জমিতে কৃষি কাজের পাশাপাশি লেবু বাগান তৈরি ও বিভিন্ন শাক ও সবজি উৎপাদন করে বিক্রয়ের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধ ও নিজেরা লাভবান হওয়া সম্ভব বলে ফজিলা খাতুন তার স্বামীকে জানান। স্ত্রীর চিন্তা ভাবনা বাস্তবসম্মত বলে স্বামী

শহিদুল ইসলাম স্ত্রীর কথায় সম্মত হয় এবং সিদীপ থেকে ঋণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।

ফজিলা খাতুন ২০২০ সালের ৩ জুলাই জৈনা ব্রাঞ্চে সিদীপের সদস্য হন এবং সিদীপ থেকে কৃষি ঋণ বা এসএমএপি ঋণ নেয়া শুরু করেন। তিনি প্রথম ধাপে ৩০,০০০ টাকা এসএমএপি ঋণ গ্রহণ করেন এবং এ টাকা দিয়ে তিনি তার ১ বিঘা জমিতে বিভিন্ন সবজি উৎপাদন করেন এবং ২ বিঘা জমিতে শাক জাতীয় ফসল উৎপাদন শুরু করেন। ফজিলা খাতুন এসএমএপি ঋণ গ্রহণের পূর্বে টেকনিক্যাল ওরিয়েন্টেশনের সময় গাজীপুরা ইউনিয়নের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার সাথে পরিচয় হয় এবং কিভাবে কৃষি কাজ করলে অধিক লাভবান হওয়া যায় সে বিষয় গুলো নিয়ে আলোচনা করেন ও বিভিন্ন উৎপাদন কৌশল জেনে নেন। পরের বছর ৩০,০০০ টাকা এসএমএপি ঋণ নেন। ঋণের টাকা ও শাক সবজি বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত আয়ের টাকা দিয়ে নিজের জমির সাথে আরও ১ বিঘা জমি লিজ নেন ও বিভিন্ন শাক সবজি উৎপাদন বৃদ্ধির করেন। এরপর ৪০,০০০ টাকা এসএমএপি ঋণ গ্রহণ করেন এবং এই টাকা ও তার আয়ের টাকা থেকে ৩০,০০০ টাকা দিয়ে তার নিজের ৩ বিঘা জমিতে পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন শাকসবজি চাষ করার পাশাপাশি লিজ নেওয়া ১ বিঘা জমিতে লেবু চাষ শুরু করেন। চতুর্থ ধাপে ৪০,০০০ টাকা এসএমএপি ঋণ গ্রহণ করেন ও ২ বিঘা জমি লিজ নিয়ে বিভিন্ন সবজি উৎপাদন বৃদ্ধি করেন। পরবর্তীতে ২০,০০০ টাকা এসএমএপি ঋণ গ্রহণ করেন এবং ঋণের ২০,০০০ টাকা ও তার আয়ের টাকা থেকে ৬০,০০০ টাকা দিয়ে ৩ বিঘা জমি লিজ নেন বিভিন্ন সবজি উৎপাদন করার জন্য। ফজিলা খাতুন বলেন যে, তার ৮ বিঘা জমি হতে প্রতিমাসে গড়ে প্রায় ১,৮০,০০০ টাকার বিভন্ন শাকসবজি বিক্রয় হয়। তিনি আরও জানান যে তার শাক-সবজি থেকে প্রতি মাসে গড় বিক্রয়কৃত ১,৮০,০০০ টাকার মধ্যে সব খরচ বাদে প্রায় ৫০,০০০ থেকে ৬০,০০০ টাকা লাভ হয় এবং বর্তমানে লেবু বাগান থেকে প্রতি বছর লেবু চারা ও লেবু হতে প্রায় নীট ৬০,০০০ থেকে ৭০০০০ টাকা আয় হয়।

বর্তমানে ফজিলা খাতুন তার আগের টিনের বেড়ার ঘর ভেঙে ইটের বাড়ি তৈরী করেন এবং স্বামী সন্তান নিয়ে এখন সুখেই সংসার করছেন। সাফল্য অর্জন করতে কঠোর পরিশ্রমের বিকল্প কোন কিছু নেই , ফজিলা খাতুন তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

*লেখক: ফিল্ড অফিসার (এগ্রি), বোর্ডবাজার ব্রাঞ্চ, সিদীপ*

# এক নারীর সফলতার কথা

মো. আব্দুল মান্নান সরদার

ছবির এই মানুষটি হচ্ছেন মোসা. মরিয়ম বেগম। স্বামী মো. রতন মিয়া। রাজশাহী শহর হতে একটু দূরে বড়গাছী ইউনিয়নের বড়গাছী এলাকার বাসিন্দা তিনি। ছোট থেকেই কৃষির সাথে পরিচিত মরিয়ম। পড়াশোনার ফাঁকে মাঝে মাঝে বাবার সাথে মাঠে যেতেন মরিয়ম। পড়াশোনা সম্ভব হয়নি। মরিয়মের বিয়ের কথা হলে বাবা তার বিয়ে দিয়ে দেন। বিয়ে হয় খেটে খাওয়া দিন মজুর রতন মিয়ার সাথে। পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া বাড়ির ভিটা আর পাশে মাত্র ২০ শতাংশ জমি আছে তাদের। বর্তমানে শাশুড়ীসহ মরিয়মের পরিবারে সদস্য সংখ্যা ৭ জন। রতন মিয়ার একার উপার্জনে সংসার চালানো কঠিন হতো। সংসারে অভাব অনটন লেগেই থাকে। মরিয়ম বেগম ছোট বেলা থেকেই পরিশ্রমী, তাই বাড়ীর আশেপাশে নিজের পরিবারের জন্য বিভিন্ন রকম সবজির বীজ বপন করতো। নিজেদের চাহিদা মিটানোর পরে অনেক সময় প্রতিবেশীরা টাকার বিনিময়ে সবজি কিনে নিতো। এখান থেকেই তিনি মাঠে সবজি চাষের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেন ।

তার চিন্তায় আসে কয়েক শতক ধানের জমি বন্ধক নিতে পারলে সেই জমিতে সবজি চাষ করতে পারতেন। মরিয়ম বেগম তার স্বামীকে বলেন সমিতি থেকে কিছু ঋণ নিতে পারলে সবজি চাষ করে কিস্তি চালানোর পাশাপাশি সংসার ভালোভাবে চালানো যেতো। এরপর তার স্বামী রাজি হন। মরিয়ম বেগম বাড়ির পাশে সিদীপের একজন মাঠকর্মীর সাথে যোগাযোগ করেন। তার পরিকল্পনার কথা মাঠকর্মীকে জানান। তিনি ৪০,০০০ টাকার ঋণ আবেদন করেন। ঋণ পেয়ে ৩০ হাজার টাকা দিয়ে ১০ শতাংশ জমি বন্ধক নেন এবং ১০ হাজার টাকা দিয়ে সবজি চাষ শুরু করেন। প্রথম অবস্থায় লাউ এবং করলার চাষ করেন। ঐ বছর মরিয়ম বেগম নিজে পরিশ্রম করেন। লাউ পরিপক্ক হলে একদিন পরপর ১৫/১৬টি লাউ এবং ৬/৭ কেজি করলা সংগ্রহ করা হতো যার আনুমানিক বাজার মূল্য ১০০০/১৫০০ টাকা। এভাবে চাষাবাদ করে খরচ বাদে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি প্রায় ১৫-২০ হাজার টাকা লাভবান হন। এরপর মরিয়মের স্বামী মানুষের কাজ বাদ দিয়ে নিজের কাজ করার চিন্তা করেন। এরপর পূর্বের ঋণ পরিশোধ হলে আবার ৪০,০০০ টাকা ঋণ নেন এবং পাশে আরো ১০ শতাংশ জমি বন্ধক নিয়ে সবজি চাষের পরিকল্পনা করেন। এর কিছু দিন পর এসএমএপি ২০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণের সময় উপজেলা কৃষি অফিসারের সাথে পরিচিত হন এবং সিদীপ কর্তৃক অয়োজিত আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে সবজি চাষ সম্পর্কে ধারণা পান এবং সেই মোতাবেক কাজ করেন। জমিতে পর্যাপ্ত জৈবসার ব্যবহার করে এবং স্বল্প জীবনকালের সবজি যেমন-গাজর, মুলা, ফুলকপি ও বেগুন চাষ শুরু করেন। ১০ শতাংশ জমিতে মুলা ও গাজর চাষ করে প্রায় ১২/১৩ মণ সংগ্রহ করেন যার বাজার মূল্য প্রায় ১৮-২০ হাজার টাকা। ১০ শতাংশ জমিতে প্রায় ১৫০০ ফুলকপি আছে যার বাজার মূল্য ৪০-৪৫ হাজার টাকা। আরও ১০ শতাংশ জমিতে বেগুন চাষ করা হয়। প্রতি সপ্তাহে ১৬০-২০০ কেজি বেগুন সংগ্রহ করে, যা প্রায় ৮-১০ হাজার টাকায় বিক্রয় করা হয়। মরিয়ম বেগম জানান চক্রাকারে সবজি চাষ করে সমস্ত খরচ বাদ দিয়ে বছরে প্রায় ৬০-৭০ হাজার টাকা লাভ করতে পারেন। তিনি আরও বলেন জৈবসার ব্যবহারে ফলন বেশী হয়েছে এবং স্বল্প মেয়াদী সবজি চাষে আয়ের পরিমাণ বেশী হয়েছে।

উপজেলা উপসহকারী কৃষি অফিসারের কথা ও সিদীপ অফিসের প্রশিক্ষণ, পরামর্শ পেয়ে সফলতা পাওয়ায় মরিয়ম ও তার স্বামী রতন মিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তারা বলেন, সিদীপ, আমাদের পরিবারের চিত্র পাল্টে দিয়েছে। তাদের সহযোগিতা আমরা সবসময় কামনা করি। তাদের পরামর্শে আমার স্বামী এখন নিজের সংসারে নিজের কাজ করে এটা অত্যন্ত গৌরবের বিষয় যার পিছনে সিদীপের অবদান বেশি। আমাদের পরিবার এখন সুখে আছে।

তার এ সকল কাজে সফলতা দেখে এলাকার অন্য সকল মানুষ কৃষি কাজ তথা সবজি চাষের প্রতি উৎসাহ পেয়েছে এবং সবজি চাষ করতে তাদের থেকে পরামর্শ নিচ্ছে।

*লেখক: ফিল্ড অফিসার (এগ্রি), পবা ব্রাঞ্চ*

# সিদীপের ২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা

সিদীপের (সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস) ২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩। সিদীপ ভবনের সম্মেলনকক্ষে সন্ধ্যায় এ সভা শুরু হয়। সিদীপ সাধারণ পরিষদের সদস্যগণ এবং সিদীপের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাগণ এবং কয়েকজন আমন্ত্রিত অতিথি এ সভায় অংশ নেন। সাধারণ পরিষদের যে সদস্যগণ সশরীরে অংশ নিতে পারেননি তারা অনলাইনে এ সভায় অংশ নেন। সিদীপ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব ফজলুল বারির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভা পরিচালনা করেন নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা। সভার কার্যক্রম শুরুর আগে বিগত অর্থবছরে প্রয়াত অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান (সিদীপ সাধারণ পরিষদ সদস্য), মো. দেলোয়ার হোসেন (ফিল্ড অফিসার) এবং বেলায়েত হোসেনকে (ফিল্ড অফিসার) গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয় ও তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। এরপর সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব ফজলুল বারি উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে সভা শুরু করেন। তিনি তার বক্তব্যে গত অর্থবছরে অর্জিত উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য টিম সিদীপকে ধন্যবাদ জানান এবং বর্তমান অর্থবছরের সমস্যাসমূহ উতরে সম্ভাবনাগুলো অর্জনের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দেন। জনাব মিফতা নাঈম হুদা ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন এবং তা অনুমোদিত হয়। তার বক্তব্য শেষে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের অডিট রিপোর্ট পেশ করেন জনাব এস. এ. আহাদ (পরিচালক-ফিন্যান্স অ্যান্ড ডিজিটাইজেশন)। এটি অনুমোদনের পর ২০২৩-২০২৪ সালের কর্ম-পরিকল্পনা ও বাজেট পেশ করেন সিদীপের জেনারেল ম্যানেজার (ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস) জনাব এ. কে. এম. শামসুর রহমান এবং তা চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। এরপর আগামী অর্থবছরের জন্য নিরীক্ষক হিসেবে আতা খান অ্যান্ড কোম্পানির নাম প্রস্তাব করা হলে সর্বসম্মতিক্রমে তা অনুমোদিত হয়। এ পর্যায়ে ডা. তাসনিম আহমেদকে সাধারণ পরিষদের নতুন সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হলে সবাই তাকে স্বাগত জানান। এরপর বিগত পরিচালনা পরিষদের তিন বছরের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় নতুন পরিচালনা পরিষদ নির্বাচন করা হয়। এতে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমির (নায়েম) প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শাহিদা আফরোজ। এ নির্বাচন শেষে বিবিধ আলোচনায় অংশ নেন পরিচালনা ও সাধারণ পরিষদের সদস্যগণ। এই আলোচনা শেষে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বার্ডের সাবেক পরিচালক জনাব নুরুন নাহার বেগম।

সিদীপের নির্বাহী পরিচালক জনাব মিফতা নাঈম হুদা তার সার্বিক পর্যালোচনায় কোভিড-১৯ পরবর্তী পরিস্থিতি এবং এ সময়ের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির আলোকে বক্তব্য রেখে আগামি বছরের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সাফল্য অর্জনের অঙ্গীকার করেন। সবশেষে সমাপনী বক্তব্য রেখে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব ফজলুল বারি।

পরিচালক: দীপংকর দীপন, অভিনয়ে: সিয়াম আহমেদ, বিদ্যা সিনহা মীম, সুনেরাহ বিনতে কামাল ও অন্যান্য

# আমার দেখা ছবি: অন্তর্জাল

## আশরাফ আহমেদ

গতকাল 'অন্তর্জাল' সিনেমাটি দেখে এলাম একরাশ মুগ্ধতা নিয়ে। বলতে লজ্জা পাচ্ছি যে সারা প্রেক্ষাগৃহে এবারও দর্শক ছিলাম আমরা মাত্র দুজন! ছবিটিকে উত্তেজনায় ভরা, 'এআই' নামে পরিচিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর এক ধরণের সাইন্স ফিকশনও বলা যায়। ফ্যান্টাসি হলেও বাংলাদেশে এতো সুন্দর ও ঝরঝরে সিনেমা তৈরী হয়, আগে জানা ছিল না। অন্তর্জাল, ইংরেজিতে যাকে আমরা ইন্টারনেট বলে জানি, তার অপব্যবহারে প্রাত্যহিক জীবন কীভাবে পর্যুদস্ত হয়ে পড়তে পারে তা দেখানো হয়েছে সুচারুভাবে। নিজেদের অজান্তে আমরা স্বল্প পরিচিত 'ডার্ক ওয়েব' এর ভয়াবহ অপরাধের শিকারে পরিণত হয়ে যেতে পারি তারও কিছুটা দেখানো হয়েছে।

একই সাথে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার ফলে দেশটির বিশ্বব্যপী চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফসল আহরণের চেষ্টার কাল্পনিক ঘটনাকে চমৎকারভাবে দেখানো হয়েছে। ইন্টারনেট এবং সাইবার সিকিউরিটির সাথে জড়িত বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত নাম বা এক্রোনিম এবং ভোকাবুলারির সাথে যে মুন্সিয়ানায় সাধারণ দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছে তা আমার কাছে অভাবনীয় মনে হয়েছে। কারণ প্রযুক্তিগতভাবে আমাদের লেখক সাহিত্যিকরা এখনো অনেক পিছিয়ে আছেন।

স্থান কাল ও পাত্রভেদে উপযুক্ত ডায়ালগও ছিল প্রশংসনীয়। প্রতিটি দৃশ্য এবং গানের সাথে সঠিক ইংরেজিতে ডাবিং থাকায় বাংলা না জানা দর্শকরাও সিনেমাটি উপভোগ করবে। তবে তার জন্য প্রয়োজন হবে সঠিক প্রচারণার।

অভিনয় বা দৃশ্য অতিরঞ্জিত বা স্বাভাবিক না হলে আমার নিন্দুকের ভূমিকার কথা আশেপাশের সবাই জানেন। কিন্তু এই সিনেমায় সমালোচনা করার তেমন কিছু আমি পাইনি। চরিত্রানুযায়ী সবাই খুব ভালো অভিনয় করেছেন। তাই বলে এটি ত্রুটিহীনও নয়। কিন্তু তা দিয়ে সিনেমাটিকে বিচার করা যাবে না।

সিনেমার রোমান্টিক ও উত্তেজনাময় কিছু দৃশ্য থাইল্যান্ডের এক স্বপ্নিল দ্বীপে ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু সিনেমাতে দেখানো ডাটা সেন্টার, মেইন ফ্রেম কম্পিউটার, সাইবার প্রযুক্তি এবং নিশ্ছিদ্র ও গোপন সভাকক্ষের দৃশ্যগুলো কোথায় ধারণ করা হয়েছে তা জানতে আমি অধিক আগ্রহী। উইকিপিডিয়াতে স্টুডিওর নাম দেয়া থাকলেও এ সম্পর্কে কোনো তথ্যই খুঁজে পেলাম না। ছয় কোটি টাকা নির্মাণ ব্যয় থেকে ধারণা করি প্রযুক্তিগত দৃশ্যগুলো বিদেশের কোথাও ধারণ করা হয়েছে। আমার অনুমান ভুল হলেই আমি খুশি হবো।

*লেখক: যুক্তরাষ্ট্র-প্রবাসী, রোকেয়া-গবেষক, অবসরপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক। বিজ্ঞান বিষয়ক রম্যগল্প, ভ্রমণ ও উপন্যাস মিলিয়ে তাঁর বারোটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।*

# সিদীপে শেখ রাসেল দিবস উদযাপন

এবছর ১৮ অক্টোবর ছিল বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৬০তম জন্মদিন। এদিন সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেসের (সিদীপ) প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ের শাখাগুলোতে যথাযথ মর্যাদায় শেখ রাসেল দিবস পালন করা হয়। এ উপলক্ষে সিদীপের শাখা অফিসসমূহে এবং প্রধান কার্যালয়ে শেখ রাসেলের প্রতিকৃতি স্থাপন করে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। সম্মেলন কক্ষে শেখ রাসেলের জীবনের ওপর এক আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান কার্যালয় থেকে দুস্থ, দরিদ্র ও এতিমদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়।

# নপম-এর জয় বাংলা ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড ২০২৩ জয়

*সিআরআই-এর চেয়ারম্যান জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়ের হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন নপম- এর সভাপতি*

গ্রামের স্কুল মাঠে বিকেলে পত্রিকা পড়ানোর কর্মসূচির মাধ্যমে ২০১১ সালে নবজাগরণ পাঠক মেলা তথা নপম-এর যাত্রা শুরু হয়। তারপর শিক্ষার্থীদের কুইজ প্রতিযোগিতা, গ্রামের মানুষের জন্য প্রজেক্টরে সিনেমা দেখানো, ছাত্রছাত্রীদের বই পড়তে উৎসাহ দেওয়া, তাদেরকে লেখালেখিতে সম্পৃক্ত করার জন্য ভাঁজ পত্রিকা প্রকাশ করার কার্যক্রম শুরু করা হয়। বই মেলা আয়োজন শুরু করা হয় ২০১২ সাল হতে। এরপর ২০১৫ সালে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ভাষা ও কম্পিউটার শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে গড়ে তোলা হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিখা একাডেমি। মূলত একটি অঞ্চলের মানুষের সার্বিক মঙ্গলের জন্য যে যে কাজ করা প্রয়োজন বলে আমাদের সময়ে সময়ে মনে হয়েছে, আমরা তা-ই তা-ই করতে উদ্যোগী হয়েছি। এ সকল কাজ করতে গিয়ে শুরুর দিকে নিজেদের পড়ালেখা, টিফিন ও মেসের মিলের থেকে টাকা বাঁচিয়ে তহবিল গড়েছি। এরপর সদস্যরা টিউশনি করে, পরিবারের থেকে টাকা নিয়ে, এমনকি আমি আমার উত্তারিকার সূত্রে পাওয়া পৈত্রিক জমি বিক্রি করে সমাজের কল্যাণে নিযুক্ত হই। আমরা কখনোই কোনো পুরস্কার পাবো এমনটা ভাবিনি, মানে পুরস্কারের জন্য আমাদের কোনো কাজ পরিচালিত হয়নি। আমরা কাজ করেছি মানুষের ভালোর জন্যে।

দীর্ঘ বারো বছর নিরলস ভাবে মানুষের কল্যাণে কাজ করার স্বীকৃতি স্বরূপ নপম ফাউন্ডেশন "জয় বাংলা ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড ২০২৩" অর্জন করেছে। গত ১৮ নভেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি উপদেষ্টা, সিআরআই-এর চেয়ারম্যান সজীব ওয়াজেদ জয় এই পুরস্কারটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করেন। - রেজাউল করিম শেখ, প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, নপম ফাউন্ডেশ।

রনি ইসলাম, ১ম শ্রেণি, সিদীপ উঠান স্কুলের শিক্ষার্থী, কাশিমপুর ব্রাঞ্চ, গাজীপুর